হজ্জের ফযীলত ও প্রস্তুতি গ্রহণ

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

৮ই এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. কৃষি মার্কেট সংলগ্ন প্রিন্স হোটেল মিলনায়তনে এস.এন ট্রাভেলসের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ান। - সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

মু'আয্যায ও মুহতারাম হুজ্জাজে কেরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে হজ্জে মাবরূর, উমরায়ে মুতাক্বাব্বালা নসীব করুন। আমীন!

আল্লাহওয়ালা হওয়ার সংক্ষিপ্ত ওযীফা

আমার পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন, দুইটি জিনিস আল্লাহর ওলি হওয়ার শর্টকোর্স। একটি রমাযানুল মুবারকের রোযা। কোন ব্যক্তি সতর্কতার সাথে, গুনাহমুক্ত অবস্থায় রমাযানের রোযাসমূহ আদায় করতে পারলে এই এক মাসের মুজাহাদা দ্বারা সে আল্লাহর ওলি হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়টি হজ্জে মাবরূর। গুনাহমুক্ত থেকে, খালেস নিয়তে হজ্জ আদায় করা হলে এই হজ্জের সফর থেকেও বান্দা আল্লাহর ওলি হয়ে ঘরে ফিরে আসতে পারে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, كيوم ولدته امه
যে দিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল সে দিনের মত নিষ্পাপ বানিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫২১)

এমনকি হাজী সাহেবদের ইস্তিকবাল করতে, ঘরে প্রবেশের পূর্বে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে, সালাম দিয়ে মুসাফাহা করতে এবং তাদের নিকট ইস্তিগফারের দরখাস্ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হাজীদেরকে মাফ করে দেন এবং তারা যাদের জন্য ইস্তিগফার করেন তাদেরকেও মাফ করে দেন। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৩৮১৭)

মাওলার ঘরে মাওলার আশেক

এমন মুবারক সফরের তাওফীক পাওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাস ইশক ও মহব্বতের আলামত। এ সফরে কোন কোন যাত্রী সত্যিকারেই আল্লাহ তা'আলার পাগল থাকে। কিন্তু দুনিয়াতে তো আল্লাহ তা'আলাকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। তাই আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে সান্ত্বনা লাভ করে।

দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ বাইতুল্লাহ; বাংলায় আমরা বলি আল্লাহর ঘর। কিন্তু শরীয়তে সব মসজিদকে বাইতুল্লাহ নামে নামকরণ করা হয়নি। শুধু একটি ঘরকে বাইতুল্লাহ বলা হয়েছে। 'আল্লাহর ঘর' এর অর্থ এই না যে আল্লাহ তা'আলা সেখানে অবস্থান করেন; নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এ ঘরের সম্মান বৃদ্ধির জন্য, খায়ের ও বরকত বুঝানোর জন্য। হাজী সাহেবগণ আল্লাহর ইশক ও মহব্বতে এ ঘর প্রদক্ষিণ করেন, যেমন মজনু লায়লার শহর প্রদক্ষিণ করত। লায়লা-মজনুর কাহিনী কোন অবাস্তব কিচ্ছা নয়। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তার প্রকৃত নাম কায়েস ইবনে মালূফ। হযরত উমর ফারূক রাযি. এর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছিল। দুনিয়াতে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলা মজনুর দিলে লায়লার মহব্বত পয়দা করে দিয়েছিলেন। এ মহব্বতের কারণে তাদের মাঝে আধুনিক প্রেম-প্রীতির ন্যায় কোন নোংরামী সংগঠিত হয়নি। লায়লার মহব্বত মজনুর দিলে ছিল; তবে পরস্পরের মধ্যে কোন দিন দেখা-সাক্ষাত হয়নি। মজনু লায়লার শহরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করত। কুতবুল আলম শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ফাযায়েলে তাবলীগের মধ্যে মজনুর কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন-

امر علي الديار ديار ليلي
اقبل ذاالجدار وذاالجدار
وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديار

অর্থ : আমি যখন লায়লার শহরের উপর দিয়ে যাই, তখন আমি এ দেয়াল সে দেয়াল চুম্বন করতে থাকি। বস্তুত শহরের ঘরবাড়ী আমাকে পাগল করেনি; বরং আমাকে পাগল করেছে এই শহরের অধিবাসিনীর মহব্বত।

ইশক ও মহব্বতের পর্যায়ক্রমিক স্তর

মজনু লায়লার মহব্বতের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর লায়লার শহরে গিয়ে অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করত। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়াতে ঈমানের দ্বারা, কালিমার দ্বারা বান্দা আল্লাহর মহব্বতের প্রথম স্তর হাসিল করে। তখন বার বার আল্লাহর নাম নিতে মনে চায়। এজন্য দ্বিতীয় স্তরে নামায, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত রাখা হয়েছে। অতঃপর মহব্বত যখন আরো গভীর হয় তখন খানাপিনা ভালো লাগে না; আল্লাহর মহব্বতে মন ক্ষুধার্ত থাকতে চায়। এজন্য রোযার বিধান দেয়া হয়েছে। এ বিধান পেয়ে আল্লাহর আশেকগণ শুধু রমাযানের রোযা রেখে ক্ষান্ত হয় না; প্রত্যেক মাসে আইয়্যামে বীয এবং সাপ্তাহিক রোযারও ইহতিমাম করে। এর পর নিজের সমস্ত প্রিয় বস্তু, ধন সম্পদ প্রিয়তমের নামে উৎসর্গ করার স্পৃহা জাগে। তাই আল্লাহ তা'আলা যাকাত, দান-খয়রাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। এভাবে মহব্বতের এককে স্তর পার হওয়ার পর এক সময় আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের জন্য বান্দা অস্থির হয়ে ওঠে। বান্দার এ আকাঙ্ক্ষা পুরণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হজ ও উমরার নির্দেশ দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার দীদার প্রসঙ্গ

দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার অসম্ভব। অনেক ভণ্ডপীর মুরীদদেরকে আল্লাহর দর্শন লাভের ওয়াদা করে। এ ধরনের কথা বলা কুফরী। যেখানে হযরত মূসা আ. এর মত শীর্ষস্থানীয় নবীর পক্ষেও আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব হল না সেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ পাকের দীদার জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তখন এমন চক্ষু দান করা হবে যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন বরদাশত করতে সক্ষম হবে, দুনিয়াতে যা মানুষের চক্ষু বরদাশত করতে অক্ষম। আল্লাহ তা'আলা তূর পাহাড়ে স্বীয় নূরের সামান্য তাজাল্লী প্রকাশ করেছিলেন। যার ফলে পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত মূসা আ. এর সাথে পাহাড়ে গমনকারী ৭০ জন মানুষ বেহুশ হয়ে গিয়েছিল। হযরত মূসা আ. আল্লাহর দরবারে দুআ' করলেন, হে আল্লাহ! এ লোকগুলো যদি মারা যায় তাহলে আমি কওমের নিকট কী জবাব দিব? অতএব আপনি আমাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিয়ে জানগুলোকে ফিরিয়ে দিন। যেখানে সামান্য নূরের তাজাল্লীর কারণে পাহাড় টুকরা হল, শক্তিশালী ৭০ জন মানুষ

বেহুশ হল সেখানে বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ করা কিভাবে সম্ভব? এ ছাড়াও আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ অসম্ভব। হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের যে বর্ণনা এসেছে তা স্বচক্ষে নয়; স্বপ্নে ছিল। (সুনানে দারেমী; হা.নং ২১৯৫)

মোটকথা, কোন কোন হাজী সাহেব সত্যিকারেই আল্লাহর পাগল থাকেন। আর কিছু হাজী সাহেব পাগলের বেশ ধারণ করেন। তখন আসলের সাথে মিলিয়ে নকল পাগলদেরকেও আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে মাফ করে দিয়ে আপন ওলি বানিয়ে নেন। এদিন শয়তান সব থেকে বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মুনাজাতের মধ্যে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করো, কান্না না আসলে কান্নার ভান করো। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩৪৮, মুআত্তা মালেক; হা.নং ১৫৯৭)

ইসলাম : যুক্তিতে নয়; মহব্বতে

হাজী সাহেবগণ আল্লাহ তা'আলার মেহমান। আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারীর স্থান ৮ তারিখে মিনায়, ৯ তারিখ রাতে মুযদালিফায় এবং ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত পুনরায় মিনায়। মেহমানদারীর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত। নবীজী ৮ তারিখের যোহর মিনার ময়দানে আদায় করেছিলেন। রাসূলের আশেকগণও ৮ তারিখে মিনায় অবস্থান করছেন। এমন যুক্তি দেখাবেন না যে, বাইতুল্লা'য় এক রাকা'আতে এক লক্ষ রাকা'আতের সওয়াব পাওয়া যায়; মিনায় এক লক্ষ রাকা'আতের ব্যাপারে তো হাদীস নেই; তাহলে যোহর মিনায় পড়ব কেন? আপনি যদি রাসূলের মহব্বতে আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারী গ্রহণ করার জন্য ৮ তারিখে মিনায় চলে আসেন তাহলে এক রাকা'আতে আল্লাহ কত লাখ রাকা'আতের সওয়াব দিবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, এক লাখ থেকে অনেকগুণ বেশি দিবেন। কোন হাজী সাহেব এক লক্ষ রাকা'আতের সওয়াব পাওয়ার জন্য ৮ তারিখে মিনায় না গিয়ে বাইতুল্লা'য় থেকে গেলে এক রাকা'আতে এক রাকা'আতেরই সওয়াব পাবে; বেশি পাবে না। কারণ বাইতুল্লাহর নিজস্ব কোন ফযীলত নেই; সমস্ত ফযীলত আল্লাহ পাকের হুকুমের কারণে। হাজী সাহেবদের জন্য এক রাকা'আতে এক লক্ষ রাকা'আতের সওয়াব আল্লাহ তা'আলা ৮ তারিখে বাইতুল্লা'য় বহাল রাখেননি। এ সওয়াব সেদিন আরো বহুগুণ বাড়িয়ে মিনার ময়দানে রেখেছেন। মোটকথা, যেদিন যে স্থানে আল্লাহর মেহমানদারী সেদিন সেখানেই থাকতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ তারিখে বাইতুল্লা'য় গিয়েছিলেন ফরয তাওয়াফ করতে। তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়া সায়ী করে বাইতুল্লা'য় যোহর না পড়ে মিনায় এসে পড়েছেন। এক রাকা'আতে এক লক্ষ রাকা'আতের সওয়াবের জন্য বাইতুল্লা'য় থেকে যাননি। কেননা ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত আল্লাহর মেহমানদারী মিনার ময়দানে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যুক্তির নাম ইসলাম নয়। আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলের তরীকা মানার নাম হল ইসলাম।

পাগলের বেশধারণ

আল্লাহর মহব্বতের শেষ মারহালায় পৌঁছে মানুষ হয়ত সত্যিকার আল্লাহর পাগল হয়ে যায়। অথবা পাগলের অনুকরণ করে, বেশ-ভুষা ধারণ করে। হজ্জের লেবাসও পাগলের লেবাসের মত। রাজা-প্রজা, প্রধানমন্ত্রী-জনগণ সকলকেই এ পোশাক পরিধান করতে হয়। মাথা খোলা রেখে একটা চাদর শরীরে আরেকটা চাদর পরনে এ অবস্থায় কখনো আরাফার মাঠে, কখনো মুজদালিফার বালুর মধ্যে পাগলের মত পড়ে থাকতে হয়। সত্যিকার আল্লাহর পাগলেরা এর মধ্যেই জান্নাতী স্বাদ অনুভব করে। কাফের মুশরিকরা হাজী সাহেবদের কাজকর্মকে অনর্থক মনে করে, কোটিপতি হয়েও সাদা চাদর পরিধান করে বালুর মধ্যে শুয়ে থাকার, উযূ ইস্তিঞ্জার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর রহস্য তাদের বুঝে আসে না। তখন মুসলমানদের নিয়ে তারা হাসি তামাশা করে। এ কারণে হজ্জের চিত্র টিভি ইত্যাদিতে প্রচার করা নিষেধ। হজ্জের সবকিছু আশেক-মাশুকের মধ্যকার ভেদ; যা গোপন রাখতে হয়। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হই, হজ্বের বিভিন্ন ছবি উঠিয়ে রাখি, ভিডিও করে রাখি। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে প্রাণীর ছবি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তি দিবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২২২৫)

সাদা ইহরামের সাদামাটা বার্তা

ইহরামের সাদা কাপড় মাইয়িতের কাপন সদৃশ। এ কাপড় মউতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যত বড় লাখপতি, কোটিপতি, মিল-ফ্যাক্টরির মালিক হোক, ইহরামের কাপড়ের মত দুটুকরো সাদা চাদরই হবে তার আখেরী লেবাস; দুনিয়া থেকে আর কিছুই কবরে তার সাথে যাবে না। যে সারা দিন সম্পদের চিন্তায় মগ্ন, মিল ফ্যাক্টরি তৈরীর ফিকিরে বিভোর সে বড় ধোঁকার মধ্যে আছে, এ সম্পদ সে অন্যের জন্য জমা করছে, যা তার বিবি বাচ্চারা ভোগ করবে। তার প্রকৃত মাল হল শুধুমাত্র দু'টি চাদর আর যা সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে। অনেক বেওকুফ অন্যের দুনিয়া সাজাতে গিয়ে নামায তরক করে, হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে সম্পদ উপার্জন করে নিজের আখেরাত বরবাদ করছে। বর্তমান মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার থিউরী গ্রহণ না করে কারূনের থিউরী গ্রহণ করছে। কারূনের থিউরী হল, হালাল-হারামের বাছ বিচার না করে মাল জমা করা। আর আল্লাহ তা'আলার থিউরী হল, আমি দিতে থাকব তোমরা দীনের পথে ব্যয় করতে থাকবে। আমার খাজানায় শর্ট পড়ার ভয় করো না; কেননা সারা দুনিয়ার মানুষের চাহিদা মিটিয়ে দিলেও আমার খাজানা খালি হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৭৭)

আত্মশুদ্ধি না থাকায় আমাদের দিল সম্পদের মহব্বতে ভরপুর, কথা কাজে মিল নেই, ওয়াদা খেলাফী করি, ওজনে কম দেই, 'মেড ইন বাংলাদেশে' 'মেড ইন জাপানে'র সিল মেরে অর্থ উপার্জন করি। সর্বোপরি অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাত বরবাদ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

নবীজী একদিন সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের চেয়ে অন্যের মাল বেশি হেফাযত করে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ এমন নয়। নবীজী বললেন, তোমরা সবাই এমন কর; কেননা সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে যে মাল তোমরা উপার্জন করছ এসবের মালিক তো তোমাদের বিবি বাচ্চারা। তোমরা শুধু এতটুকুর মালিক যতটুকু তোমরা দান খয়রাত করে পরকালের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছ। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৫৪)

অন্তরকে মালের মহব্বত থেকে পবিত্র করার জন্য কোন হক্কানী আল্লাহওয়ালার সোহবত গ্রহণ করতে হবে। যে সাপের মন্ত্র জানে সে সাপখেলা দেখিয়ে অর্থোপার্জন করার সময় তার প্রাণভয় থাকে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে থেকে দিলকে মালের মহব্বত থেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে মাল নামক বিষধর সাপ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরং এ মাল তার জন্য রহমত হয়। সে সম্পদ ব্যবহার করে দীনের দাওয়াত নিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, হজ্জ উমরা পালন করে, মসজিদ মাদরাসা তৈরী করে; সবগুলো কাজই মুবারক আর মুবারক। পক্ষান্তরে মালের মহব্বত যদি দিল থেকে বের না হয় তাহলে মালের দংশনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা টাকার হিসাব দিতে হবে; কিভাবে উপার্জন করেছ? হালাল পন্থায় না কি হারাম পন্থায়? কোথায় খরচ করেছ? গরীবের কষ্টের সময়, মসজিদ মাদরাসার প্রয়োজনের সময় মাল খরচ করেছিলে না কি কারূনের মত জমিয়েছিলে? কোন কোটিপতি পর্যন্ত একটা টাকা অনর্থক খরচ করার অধিকার রাখে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা স্বীয় সম্পদ অনর্থক ব্যয় করো না; আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এর দ্বারা আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য; অনর্থক খরচ করার জন্য নয়। হাদীস শরীফেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৬১২৫)

হজ্জের প্রস্তুতির জন্য দু'আ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আমল ছিল রমাযানুল মুবারকের জন্য দুই মাস আগে থেকে তিনি দু'আ জারি রাখতেন। জীবনে একটা রমাযান পাওয়া মানে আল্লাহ তা'আলার প্রভূত নৈকট্য লাভ করা। রমাযানের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য দু'আ করতে হবে। আর আমরা যারা হজ্জের নিয়ত করেছি আমাদেরও দু'আ চালু রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে হজ্জ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন। মক্কায় পৌঁছার পর এক জনকে দেখেছি নাস্তা করে উমরা করতে যাবে, হঠাৎ হার্ট এটাক করে মারা গেছে।

শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করার দ্বারাও সওয়াব পাওয়া যায় তবে হজ্জ সম্পন্ন করার ভিন্ন একটা বরকত আছে। মূলত সওয়াব দুই প্রকার। এক হল কানূনী বা আইন মোতাবেক সওয়াব। আরেক হল ইন'আমী বা পুরস্কারের সওয়াব। কানূনী সওয়াব হজ্জের নিয়ত করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু হজ্জ সম্পন্ন করলে কানূনী সওয়াবের সাথে সাথে ইন'আমী সওয়াবও পাওয়া যাবে। ইন'আমী সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের কানূনী সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু যদি আল্লাহর কোন বান্দা পূর্ণ এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে সে কানূনী বা আইন মোতাবেক সওয়াবের সাথে সাথে ইন'আমী বা পুরস্কারের সওয়াবও পাবে। কানূনী সওয়াবের সাথে ইন'আমী সওয়াব পাওয়ার জন্য দু'আ জারি রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে সত্যিকারার্থে আল্লাহর আশেক হয়ে সরেজমিনে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার, মিনা, মুযদালিফা এবং আরাফার ময়দানে আল্লাহর মেহমানদারী গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন

হজ্জের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

অনেক হক্কানী উলামায়ে কেরাম হজ্জের ট্রেনিং দিয়ে থাকেন, হজ্জের উপর বিভিন্ন কিতাবাদিও রচনা করেন সেগুলো সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে থাকি এবং খোঁজ খবর নিয়ে হজ্জের ট্রেনিংয়েও শরীক হই। আলহামদুলিল্লাহ জামি'আ রাহমানিয়ায় প্রতি বছর শাওয়ালে হজ্জের প্রথম ফ্লাইট শুরু হওয়ার পূর্বে ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে হাতে কলমে হজ্জের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আগে থেকে তারিখ জেনে নিয়ে নিজে এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যারা হজ্জে যাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারি। বহু বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহ তা'আলা আমাকেও হজ্জের উপর কিতাব লেখার তাওফীক দিয়েছেন; যা সুবিধার জন্য পকেট সাইজ বড় সাইজ উভয় সাইজে ছাপা হয়েছে। হজ্জের সফরে এ কিতাবটিও সাথে রাখলে আশা করি ফায়েদা হবে।

হজ্জ এমন একটা আমল যে, সেখানে গেলে বড় বড় আলেমগণও মাসআলা ভুলে যান। মোল্লা আলী কারী রহ. গুনইয়াতুন্নাসিক নামে হজ্জের উপর সবচে' নির্ভরযোগ্য কিতাব লিখেছেন। তিনি একবার মাসআলা ভুলে গিয়েছিলেন। মাসআলাটি হল, মক্কার বহিরাগতদের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা। আমরা যেমন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ি, হারামে তাহাইয়্যাতুল মসজিদ হল তাওয়াফ করা। মোল্লা আলী কারী রহ. তাওয়াফ না করে তাহিইয়্যাতুল মসজিদ পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। এক গ্রাম্য লোক এসে ধমক দিয়ে বললেন, তাহিইয়্যাতুল মসজিদ পড়ছেন কেন? বহিরাগতদের জন্য বাইতুল্লা'য় প্রথম কাজ তো হল তাওয়াফ করা। আপনি কি মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পড়ে আসেননি? মোটকথা, দুনিয়ার কাজ এদিক সেদিক করে হলেও হজ্জের ট্রেনিংয়ে শরীক হওয়ার চেষ্টা করবেন।

আল্লাহর ঘরে দুনিয়ার দাওয়াত

আরেকটি জরুরী বিষয় হল, হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় লাগিয়ে যাওয়ার ফিকির করবেন, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে দুনিয়া বিছিয়ে রাখা হয়েছে; বাইতুল্লা'য় আসা-যাওয়ার পথে দুনিয়া আপনাকে দাওয়াত দিতে থাকবে। আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় লাগিয়ে গেলে দুনিয়া আপনাকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। নিরিবিলি ইবাদত বন্দেগীতে মাশগুল থাকবেন। বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত। বারবার উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করার সওয়াব বেশি। যখন চলে আসার ২/৪ দিন বাকী থাকে তখন সুন্নাত হিসাবে বিবি বাচ্চাদের জন্য কিছু কাজের জিনিস, যেমন জায়নামায, তাসবীহ, আতর ইত্যাদি ক্রয় করতে পারেন। শুরুতেই কেনাকাটা করা বোকামি। এতে এগুলো পাহারা দেয়া, মক্কা মদিনায় টানাটানি করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেরেশানী ভোগ করতে হয়।

মাকবূল হজ্জের শর্ত

আখেরী কথা হল, হজ্জে মাবরূর বা মাকবূল হজ্জের জন্য চারটি শর্ত। **প্রথম শর্ত :** বান্দার হক আদায় করে যাওয়া। পিতার ইন্তিকালের পর যারা বোনদেরকে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করে দেননি অবশ্যই তাদের হক বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। কাউকে গালি দিয়ে থাকলে তার কাছেও মাফ চেয়ে নিবেন। মৃত্যুর পূর্বে যেমন সবার কাছে মাফ চাওয়া হয় তেমনি হজ্জে যাওয়ার পূর্বেও সকলের থেকে মাফ চেয়ে নিবেন।

দ্বিতীয় শর্ত : নিয়তকে খালেস করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইশক মহব্বতের জন্য যাওয়া; দুনিয়াবী কোন গরজ না রাখা।

নফস আপনার সামনে অনেক কিছু পেশ করবে যে, তোমাকে আলহাজ বলা হবে, মসজিদ মাদরাসার সভাপতি বানানো হবে ইত্যাদি। নফস যতবার ধোঁকা দিবে ততবার প্রতিহত করবেন। নতুন করে আল্লাহর রেযামন্দির নিয়ত করবেন। তাহলে আপনাকে ক্ষতি করতে পারবে না। দিলে এসব ধারণা আসা রিয়া নয়; এটাকে বলা হয় ওয়াসওয়াসায়ে রিয়া। নিয়ত গলত থাকলেও পুনরায় সহীহ করা যায়। শরীয়ত এত কঠিন না যে, নিয়ত একবার গলত হয়ে গেলে আর কখনো শুদ্ধ করা যাবে না। শরীয়ত জানা থাকলে সবকিছু সহজ।

তৃতীয় শর্ত : হজ্জের সফরে ইচ্ছাকৃত কোন গুনাহ না করা। অনেক মহিলা পর্দা করার তরীকা জানা না থাকার কারণে মুখ খোলা রাখে। আমাদের দেশের ক্যাপের মত কপালে কিছু বেঁধে তার উপর দিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে দিতে হয়। এতটুকু না জানার কারণে মহিলারা মুখ খোলা রাখে। আর কিছু ভাই সারাদিন ইরানী গোলাপ, মালোশিয়ান চামেলী দেখতে থাকে। কত বড় গুনাহের কাজ! আরেকটি গুনাহ হল, বিভিন্ন হোটেলে টেলিভিশন চলে আর অনেক হাজী সাহেব বসে বসে দেশের খবর নিতে থাকে। দেশের খবর নিতে গিয়ে নিজের হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর থাকে না। মানুষকে গুনাহের দৃশ্য দেখা না দেখার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। চোখের উপর পর্দা রয়েছে; গুনাহের মুহূর্তে বন্ধ করা যায়। গুনাহের জিনিস দেখলেই চক্ষু বন্ধ করে দিবেন। আর বর্তমানে মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি তোলা তো ব্যাপক হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর ছবি তোলে। ইয়াহুদীরা প্রত্যেক মুসলমানকে ফটোগ্রাফার বানিয়ে দিয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন জানদারের ছবি উঠায় হাশরের মাঠে তাকে ঐ ছবিতে জান দিতে বলা হবে; অন্যথায় কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২২২৫) ক্যামেরা বিশিষ্ট মোবাইল ব্যাহার করবেন না। যদি করতেই হয় তাহলে ক্যামেরার উপর পট্রি লাগিয়ে দিবেন যাতে গুনাহের সুযোগই না থাকে।

চতুর্থ শর্ত : হজ্জ থেকে ফেরার পর আমাদের যিন্দেগী যেন আগের থেকে বেশি আখেরাতমুখী হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার যেন দীন থেকে গাফেল করতে না পারে। দিল যেন থাকে আল্লাহর হুকুমের দিকে, মসজিদ মাদরাসার দিকে, হক্কানী উলামায়ে কেরামের মজলিসের দিকে। আমাদের দিল মুর্দা হয়ে গেছে; উলামায়ে কেরামের মজলিসে যেতে চায় না। অথচ কিতাবে এসেছে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দাও; তারপর মায়ের দুধ পান করাও। এর দ্বারা বোঝা গেল, বাচ্চার শারীরিক খোরাকের চেয়ে রূহানী খোরাকের প্রয়োজন বেশি। কিন্তু আমরা রূহানী খোরাক আল্লাহওয়ালাদের সোহবত থেকে একেবারেই মাহরূম। বছরে একবারও যাওয়ার সুযোগ হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের দীনদারী কিভাবে উন্নত হবে? সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কিভাবে কায়েম থাকব? এমন হলে যে কোন সময় শয়তান ধোঁকায় ফেলতে পারে। আল্লাহ হিফাযত করুন।

হজ্জে মাবরূরের মোটামুটি চারটা শর্ত বলা হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হজ্জে মাবরূর নসীব করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : ইসমাতুল্লাহ, দারুল ইফতা ২য় বর্ষ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

(২৯ পৃষ্ঠার পর; গ্রন্থ পরিচিতি)

পাঠক মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যায় হযরতের জীবনের পরতে পরতে, নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে প্রতি ছত্রের বর্ণনায়।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেন, 'ইসলামী দুনিয়ার ছাত্র, শিক্ষক, আলেম, গাইরে আলেম অর্থাৎ বিশেষ ও সাধারণ সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়েছে বলেই গ্রন্থখানির এত মর্যাদা। রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার পথের পথিকদের জন্য অর্থাৎ পীর-মুরীদ ও শাইখ-মাশায়েখের জন্য তো এ পুস্তক এক দুর্লভ রত্ন। রূহানিয়াতের এই দুর্ভিক্ষের যুগেও এ গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সাধনার পথযাত্রীদের সম্মুখে আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।'

ভাষান্তর

উর্দূ ভাষায় রচিত চার খণ্ডে সমাপ্ত 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমাদ; যা 'আশরাফ চরিত' নামে চার খণ্ড এক ভলিয়মে 'মাকতাবাতুল আশরাফ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমাদ অনুবাদে কতটা দক্ষ ও সফল তা আমরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষা-বিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহাম্মদ রহ. এর মুখ থেকেই শুনি– তিনি বলেন, 'অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আরবী, উর্দূ, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত। একদিকে তিনি ইংরেজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং কর্মজীবনে সরকারি কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। আরেকদিকে তিনি কওমী মাদরাসার মহান উস্তাদ হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ., হযরত মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ., হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব রহ.,শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক প্রমুখ সমকালীন মনীষীবর্গের নিকট অধ্যয়ন করেছেন এবং আরবী ও উর্দূ ভাষায় অভিজ্ঞ হয়েছেন। এ দুই ভাষায় তার জ্ঞান উন্নত মানের। তাছাড়া বাংলা ভাষায়ও তার পড়াশোনা প্রচুর। কাজেই চারটি ভাষায়ই তার দখল সাধারণের উর্ধ্বে।

তার অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মূলানুগ। পড়তে গিয়ে পাঠককে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। সাধারণ অনুবাদে যেমন অনুবাদের রস-ই প্রধান হয়ে ওঠে; এ গ্রন্থ তার ব্যতিক্রম। তার রচনাশৈলীর গুণে অনুবাদও মৌলিক রচনার মতোই স্বচ্ছ সাবলীল।

তিনি কোথাও বিষয়াতিরিক্ত অতিশায়ন কিংবা রসহীন তরজমা করার প্রয়াস পাননি। ভাষা তার আয়ত্বে থাকায় সর্বত্র একটা কোমল পেলব প্রলেপের আবেশ তরজমাখানীর মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটেছে। এছাড়া বাংলা বানানরীতি, প্রতিবর্ণায়ন, ব্যাকরণসিদ্ধতা, প্রয়োগ যোগ্যতা ও প্রয়োগবাহুল্য এ সবের প্রতি এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি সাধারণত লেখকদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। অনুবাদক গিয়াসুদ্দীন আহমাদ এ কঠোর কাজটি অন্তর্দৃষ্টি ও একাগ্রতার সাথে করতে পেরেছেন দেখে আমি অবাক হয়েছি। এ কর্মে তার মেধা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও একাগ্রতা আমাকে অভিভূত করেছে।

মোটকথা, 'আশরাফ চরিত' সহজ সরল ভাষায় সুলিখিত একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক গ্রন্থখানি পাঠে এক মোহময় জগতের অতৃপ্ত আত্মার আকুল আহ্বানে ভাবলোকে বিচরণ শেষে সপ্তাকাশ পরিভ্রমণের আনন্দে পরম পবিত্র সত্তার স্নেহছায়ায় গৌরবময় অনুভূতির তীক্ষ্ণ তীব্র বোধীতে উত্তীর্ণ হয়ে শান্ত সমাহিত চিত্তে বলে উঠবে-

سپردم بتو مایۂ خویش را
تو می دانی حساب کم و بیش را۔

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই মহামনীষী আশরাফ আলী থানবী রহ. এর জীবনী 'আশরাফ চরিত' বার বার পাঠ করে প্রকৃত আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে রব্বে কারীমের দরবারে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করেন।

লেখক : শিক্ষক, আশরাফুল মাদারিস
সতীঘাটা, পান্তাপাড়া, সদর যশোর

দি ক নি র্দে শ না মূ ল ক ব য়া ন

হজ্জ সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

১৯ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুর জেলাধীন কাপাসিয়া থানার ইমাম সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হজ্জ ও উমরা প্রশিক্ষণ সেমিনারে কাপাসিয়া কেন্দ্রীয় তাবলীগ মারকায জামে মসজিদে প্রদত্ত বয়ান। -সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

হযারাতে উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে মুহতারাম ও সর্বস্তরের মুসলমান ভায়েরা! আজ আমাদের ইজতিমা ইসলাম নামক ইমারতের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ 'হজ্জ'কে কেন্দ্র করে। যা হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। হজ্জ জীবনে একবার ফরয হয়। নগদ টাকা না থাকা সত্ত্বেও কারো জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটবে না, সংসার অচল হয়ে পড়বে না, হজ্জের যাতায়াত খরচও স্বাভাবিকভাবে হয়ে যাবে, কারো কাছে এই পরিমাণ বাড়তি সম্পদ থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয হয়। যদিও তার কাছে নগদ টাকা না থাকে। উদাহরণস্বরূপ কারো ১০ বিঘা জমি আছে, কিছু জমি বিক্রি করলে হজ্জ করা যায়, তেমন কোন অসুবিধা হয় না তাহলে জমির কিছু অংশ বিক্রি করে তাকে হজ্জে যেতে হবে। অনেকে মনে করে নগদ ৩ লাখ টাকা না থাকলে হজ্জ ফরয হয় না। অনেকে চাকুরী শেষে এককালীন কয়েক লাখ টাকা পেনশন পেয়ে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখে লাভ (সুদ) খেতে থাকে। মনে করে এ টাকা তো এখন উঠানো যাবে না অতএব আমার উপর হজ্জ ফরয না। অথচ মাসআলা হল, এক বছর সংসার চলে এ পরিমাণ টাকা রেখে বাকি টাকা দিয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে। এরপরও অবশিষ্ট থাকলে কোন হালাল জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারে। ব্যাংকে রেখে সুদ খেতে খেতে মারা গেলে আল্লাহর কাছে কী জবাব থাকবে? এভাবে অনেকে ভুলের মধ্যে আছে। হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও আদায় করে না। উলামায়ে কেরামের নিকট মাসআলাও জিজ্ঞাসা করে না।

হজ্জ যে বছর ফরয হয় ঐ বছর করা ওয়াজিব। আমার বাড়ির কাজ শেষ হয়নি, ব্যবসা এলোমেলো, মেয়ে বিবাহ দেয়া বাকি, এগুলো নিছক বাহানা; শরীয়তে এগুলো ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিলম্ব করলে প্রত্যেক বছর ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে। যদিও পরে করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু বিগত বছরগুলোর গুনাহের শাস্তি কে ভোগ করবে? দেরি করতে নিষেধ করার কারণ হলো, অনেক সময় টাকা হাত ছাড়া হয়ে যায়, শরীর সুস্থ থাকে না, হায়াত শেষ হয়ে যায়, তখন হজ্জ না করেই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়। হজ্জ না করে মারা গেলে হাদীস শরীফে কঠিন ধমকি এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন ব্যক্তি ইয়াহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে মরুক আমি কোন পরোয়া করি না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৮১২)

হজ্জ করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। অনেক দৌড়ঝাঁপের কাজ আছে। যুবক বয়সে গেলে সুন্দরভাবে হজ্জ করা যায়। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে যায়। তাদের পক্ষে ২০/৩০ লাখ মানুষের মধ্যে তাওয়াফ করা, সায়ী করা, কঙ্কর মারা যথাযথভাবে সম্ভব হয় না। অন্যের মাধ্যমে করাতে হয়। এজন্য শক্তি থাকতে হজ্জ করা উচিত। মালয়েশিয়ার ছেলে-মেয়েদের হজ্জ না করলে বিবাহই হয় না। তারা সকলেই যুবক বয়সে হজ্জ করে আর আমরা বেশির ভাগ বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করি।

হজ্জ যদিও জীবনে একবার ফরয হয় তবে এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যাকে শারীরিক সুস্থতা এবং আর্থিক সামর্থ্য দান করেছেন, তার জন্য (কমপক্ষে) প্রতি পাঁচ বছরে একবার বাইতুল্লা'য় উপস্থিত হওয়া উচিত। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৭০৩) কারণ ফরয নামাযের জামা'আত চলাকালীন সময়টুকু ছাড়া বাকি পুরোটা সময় এ ঘরের তাওয়াফ চালু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ জীবনে শুধুমাত্র একবার হজ্জ করলে কিভাবে তা চালু থাকবে? যতদিন আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দেন হজ্জে-উমরায় যেতে থাকেন।

হজ্জের মধ্যে অনেক নসীহত রয়েছে। ইহরামের কাপড় স্মরণ করিয়ে দেয়– বড় বড় মার্কেট, বাড়ি, শিল্প-কারখানা সব অন্যের সম্পদ; তোমার সম্পদ দু'টো সাদা কাপড় আর যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আগে পাঠিয়ে দিয়েছ তা।

আমাদের দেশের লোকেরা হজ্জের সফরে সাধারণত তামাত্তু' করে। অর্থাৎ প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে। উমরা শেষ করে সাধারণ পোশাকে অবস্থান করে। এরপর হজ্জের পূর্বে নতুন করে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জ করে। উমরার মধ্যে দু'টি কাজ ফরয। ইহরাম বাঁধা, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা। আর দু'টি কাজ ওয়াজিব। সাফা মারওয়া সায়ী করা, মাথা মুণ্ডানো।

উমরার বিবরণ

প্রথমে উমরার মাসআলা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। উমরার জন্য প্রথমে ইহরাম বাঁধতে হয়। ইহরাম হল, অবাঞ্ছিত লোম, নখ ইত্যাদি কেটে, পাক সাফ হয়ে গোসল করে পুরুষের জন্য শরীরের নিচের অংশে মোটা চাদর এবং গায়ে আরেকটি চাদর পরিধান করা (আর মহিলাদের জন্য তাদের সাধারণ পোশাকই পরিধান করা)। এর পর দুই রাকা'আত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিয়ত করা। এই দুই রাকা'আত নামায সুন্নাত। নিয়ত এই-

اللهم اني اريد العمرة فيسرها لي و تقبلها مني

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি উমরার নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।

আরবীতে না পারলে বাংলায়ও নিয়ত করা যাবে। নিয়ত করে তালবিয়া পড়লে ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। অনেকে শুধু ইহরামের কাপড় পরিধান করাকে ইহরাম মনে করে।

অনেকে ইহরামের কাপড় লাগেজে দিয়ে দেয়। এয়ারপোর্টে গিয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করার সময় দেখে লাগেজ বিমানে ঢুকে গেছে। তাদেরকে আমরা একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দেই যে, ইহরামের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে আপনি পেরেশান হবেন না। একসময় বিমানে ঘোষণা হবে

'আধা ঘণ্টা পর বিমান ল্যান্ড করবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মীকাত অতিক্রম করব' তখন বিমানের সিটে বসে সাধারণ কাপড়েই ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নিবেন এতেই ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। বিমানবন্দরে নামার পর ইমিগ্রেশন হয়ে গেলে লাগেজ খুলে তখন ইহরামের কাপড় পরে নিন। তাতে সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা সাধারণ লেবাসে থাকা হয়। এর কারণে দম ওয়াজিব হবে না। দিনের বেশির ভাগ সময় সাধারণ লেবাস পরা থাকলে দম ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ একটি বকরী কুরবানী করতে হয়। এতে আনুমানিক চার শ রিয়াল পড়ে। যা গরীবরা খেতে পারবে, আপনি পারবেন না। মাসআলা জানা থাকলে অনেক কিছু সহজ। না জানার কারণে অনেকে ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে গুনাহগার হয়।

তো ইহরাম চাদর পরিধানের নাম নয়; নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার নাম ইহরাম। তালবিয়া নিজে নিজে পড়তে হবে। সম্মিলিতভাবে পড়া অনুচিত। তালবিয়ার মধ্যে চারটি বাক্য আছে, যা চার শ্বাসে পড়তে হয়-

لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك

অনেকে তৃতীয় বাক্যটি তিন টুকরো করে পড়ে। প্রথমে ان الحمد বলে থামে। তারপর والنعمة বলে আবার থামে। এরপর لك والملك বলে। অর্থাৎ চারটি বাক্য চার শ্বাসে না পড়ে সাত শ্বাসে পড়ে। এটা অনুচিত। চার বাক্য চার শ্বাসেই পড়ার নিয়ম।

তালবিয়াতে لا شريك لك বাক্যটি দু'বার উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমান শিরকমুক্ত না হলে কোন মূল্য নেই। হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তালীমুদ্দীন, আমার লেখা কিতাবুল ঈমান যার সংক্ষেপ এসো ঈমান শিখি– এসব কিতাব থেকে দৈনন্দিন একটা করে পয়েন্ট মসজিদে মসজিদে তা'লীম শুরু করুন। তাহলে মানুষের ঈমান সহীহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তা'লীমের সাথে সাথে দাওয়াতের মেহনতও করতে থাকেন যাতে ঐ কথাগুলো দিলে বসে যায়।

তালবিয়া

তো দুই রাকাআত নামায পড়ার পর নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার দ্বারা ইহরাম হয়ে গেল। এখন বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে থাকুন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত হলে সালামের পূর্বে তালবিয়া, নামায শেষে ইসতিগফারের পূর্বে তালবিয়া, উপরে উঠা ও নিচে নামার সময় তালবিয়া– মোটকথা সব জায়গায় তালবিয়া জারি রাখুন।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে কিছু আল্লাহ তা'আলার হকের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, গুনাহ করা যাবে না। গুনাহ করলে হজ্জে মাবরূর বাতিল হয়ে যায়। কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত। তাই কিছুতেই গুনাহ করা যাবে না।

কিছু বিষয় নিজের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, নখ, মোচ, চুল কাটা এবং পুরুষের জন্য মাথা, চেহারা এবং জুতা বা মোজা দ্বারা পা ঢেকে রাখা। তবে কাঁথা বা লেপ দিয়ে মাথা ও চেহারা বাদ দিয়ে পুরো শরীর ঢাকা যাবে।

আর কিছু পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, শরীরের গঠনে সেলাই করা পোশাক পরিধান করা। খোশবু ব্যবহার করা। সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা ইত্যাদি। এগুলোও করা যাবে না। পানের সাথে সুগন্ধ জর্দা খাওয়া যাবে না।

কিছু বিষয় বিবির সাথে সম্পৃক্ত যদি বিবি সাথে থাকে। যেমন, তার সাথে মহব্বতের কথা বলা যাবে না। মহব্বত করার তো প্রশ্নই আসে না।

কিছু অন্যান্য হাজীদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, তাদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, হাতাহাতি, মারামারি ইত্যাদি অশোভন আচরণ করা যাবে না।

কিছু বিষয় জীবজন্তুর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, কবুতর, হরিণ বা কোন প্রাণী শিকার করা যাবে না। মাছি ও ছারপোকা মারা যাবে না। তবে মশা, সাপ ও পাগলা কুকুর মারা যাবে। পালা হাঁস-মুরগীও জবাই করার অনুমতি আছে।

যাই হোক, বিমান একসময় জেদ্দা বন্দরে অবতরণ করবে। সেখানে প্রত্যেক দেশের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা বিশ্রামাগার আছে। আপনি বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত স্থানে চলে যাবেন। লাগেজ সেখানের কুলিরাই বহন করবে। আপনি সাথে ছোট একটা হাতব্যাগ রাখবেন। জরুরী ঔষধ, টাকা, টিকিট ইত্যাদি জিনিস সবসময় হাতব্যাগ অথবা কোমর ব্যাগে রাখবেন। লাগেজে রাখবেন না। অনেক সময় লাগেজ পেতে দেরি হয়। তখন এসব জরুরী জিনিস সাথে না থাকলে ঝামেলায় পড়তে হয়।

বিমানবন্দর থেকে মুয়াল্লিমের গাড়ি আপনাকে মক্কায় নিয়ে যাবে। যারা আগে মদীনায় যাবেন তাদের জন্য দেশ থেকে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। ইহরাম ছাড়াই মদীনায় যাবেন। মক্কায় আসার পথে মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে গাড়ি থামবে। সেখানে বিশাল মসজিদ আছে। উযূ-গোসলের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আপনি উযূ-গোসল সেরে এ মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবেন। মক্কায় পৌঁছার পর ঘর্মাক্ত লেবাসে, ক্লান্ত শরীরে তাড়াহুড়ো করে মসজিদে যাবেন না। বরং কিছু খেয়ে, গোসল ইত্যাদি সেরে ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে বাইতুল্লা'য় গিয়ে উমরার তাওয়াফ করবেন। নবীজী হজ্জের সফরে যী-তুয়ার একটি মহল্লায় রাত্রি যাপন করেছেন। সকালে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করার পর বাইতুল্লা'য় প্রবেশ করেছেন।

তাওয়াফ করার পদ্ধতি

মাতাফে (তাওয়াফের স্থানে) যেতে হয় মসজিদে হারামের ভেতর দিয়ে। অতএব মসজিদে প্রবেশের পাঁচটি সুন্নাত আদায় করবেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে বাইতুল্লাহ নযরে পড়বে। বাইতুল্লাহ নযরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিন। এ সময় দু'আ কবুল হয়। সুতরাং খুব দু'আ করবেন। যা মনে চায় দু'আ করবেন কিন্তু ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়ার দু'আ করতে ভুলবেন না। এরচে বড় কোন দু'আ নেই।

দু'আ করে সামান্য অগ্রসর হলে মাতাফ। মসজিদে হারাম থেকে সামান্য নিচু। মাতাফে এসে তালবিয়া বন্ধ করুন। তাওয়াফ মাতাফ দিয়েও করা যায়; আবার মসজিদে হারামের দোতলা, তিনতলা এবং ছাদেও করা যায়। সুযোগ থাকলে নিচ দিয়েই করবেন।

নতুন তাওয়াফের শুরুতে ইজতিবা করতে হবে (শরীরের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা)। ইজতিবা করে হাজরে আসওয়াদের দিকে যাবেন। মসজিদের যে দিকে সবুজ টিউব লাইট এবং একটিমাত্র মিনার আছে হাজরে আসওয়াদ সে দিকে অবস্থিত। মসজিদুল হারামের সব দিকেই জোড়া মিনার। শুধু হাজরে আসওয়াদের দিকে একটি মিনার। বাইতুল্লাহর কোনায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা। মাথা প্রবেশ করালে পাথরের সাথে মুখ ছোঁয়ানো যায়। আপনারা মুখ লাগাতে চেষ্টা করবেন না; দূর থেকে ইশারা করবেন। কারণ সেখানে আতর মাখানো থাকে।

ইহরাম অবস্থায় আতর লাগানো নিষেধ। আবার বিভিন্ন দেশের বিশালদেহী মানুষের ভীড় থাকে। তাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে গেলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

নবীজী বিদায় হজ্জে হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দেননি। যাতে পরবর্তী দুর্বল উম্মত চুমু খেতে না পারলে মন খারাপ না করে। যা হোক, তাওয়াফের শুরুতে আপনি বাইতুল্লাহর দক্ষিণ পূর্বকোণে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ আপনার ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমার মতো কান বরাবর হাত উঠিয়ে باسم الله اكبر ولله الحمد বলে ছেড়ে দিবেন। এরপর হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারা করে باسم الله الله اكبر বলে আওয়াজ ছাড়া হাতে চুমু দিবেন। তারপর সীনা সোজা করে তাওয়াফ শুরু করবেন। প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। অর্থাৎ বাহাদুরের মত হেলেদুলে চলবেন (এভাবে চলাকে রমল বলে)। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন মক্কার কাফেররা মদীনার আবহাওয়া ইত্যাদির কারণে তাদেরকে দুর্বল মনে করত। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রথমবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে আসলে মক্কার কাফেররা বাইতুল্লাহর উত্তর পার্শ্বের এক পাহাড়ে সমবেত হয়েছিল মদীনা থেকে আগত লোকদের তামাশা দেখার জন্য। ভেবেছিল দুর্বলতার কারণে তারা উদ্যমের সাথে তাওয়াফ করতে পারবে না। হযরত জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে বিষয়টি অবহিত করলে নবীজী সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে প্রথম তিন চক্করে রমল করার হুকুম দিলেন।

তো তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে ঘুরে প্রথম বারের মত হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারা করে باسم الله أكبر বলে আওয়াজ ছাড়া হাতে চুমু দিবেন। এরপর সীনা সোজা করে আবার চলা শুরু করবেন। তাওয়াফের শুরুতে একবার এবং প্রত্যেক চক্করের শেষে একবার মোট আটবার চুমু দিতে হবে। তাওয়াফের সময় কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে যিকিরের সওয়াব বেশি। সুবিধার জন্য আমিও যিকিরের একটা পদ্ধতির কথা বলি। এর দ্বারা চক্কর গণনার জন্য হাতে সাত দানার তাসবীহ রাখার প্রয়োজন হবে না। যিকিরই স্মরণ করিয়ে দিবে যে, আপনি কত নম্বার চক্করে আছেন। পদ্ধতিটা হল, কালিমায়ে সুওম سبحان الله، والحمد لله، ولااله الاالله، والله أكبر এর মধ্যে চারটি বাক্য আছে। প্রথম চার চক্করে এ বাক্যগুলো পড়বেন। অর্থাৎ প্রথম চক্করে سبحان الله। দ্বিতীয় চক্করে والحمد لله। তৃতীয় চক্করে ولااله الاالله। চতুর্থ চক্করে والله أكبر। পঞ্চম চক্করে বুখারী শরীফের শেষ হাদীস سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। ষষ্ঠ চক্করে যে কোন দুরূদ শরীফ এবং সপ্তম চক্করে যে কোন ইস্তিগফার। প্রত্যেক চক্করে বাইতুল্লাহর দক্ষিণ পাশে এসে ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار পড়বেন। এই সাত চক্কর মিলে এক তাওয়াফ হল। সপ্তম চক্করে শুরু থেকেই একটু একটু করে একেবারে কিনারায় চলে যাবেন। তাহলে তাওয়াফের কাতার থেকে বের হতে মোকাবেলা করতে হবে না। এখন কাজ হল, মাকামে ইবরাহীম এবং বাইতুল্লাহ একসাথে সামনে হয়, সম্ভব হলে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নামায পড়ুন। তাওয়াফের শুরুতে ইজতিবার জন্য আপনার ডান কাঁধ খোলা রেখেছিলেন এই দুই রাকাআত নামাযের সময় কাঁধ ঢেকে নিন। তাওয়াফ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল হোক তাওয়াফ শেষে দুরাকাআত নামায পড়া ওয়াজিব। হাজরে আসওয়াদ বরাবর কিনারায় অনেক পানির কল দেয়া আছে। নামায শেষে সেখানে গিয়ে তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করুন। তওয়াফের কাজ এখনেই শেষ।

সাফা মারওয়ার সায়ী

এখন সাফা মারওয়া সায়ী করতে হবে। সায়ী করা ওয়াজিব। সাফা-মারওয়া মসজিদুল হারামের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। মাকামে ইবরাহীম বরাবর পূর্ব দিকে যমযমের পানি পানের স্থানে লেখা আছে বাবুস সাফা। তো সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে হাত তুলে দু'আ করুন। দু'আ শেষ করে ডান পাশ দিয়ে নেমে মারওয়ার দিকে চলতে থাকুন। মাঝখানে সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানে সামান্য দ্রুত হাঁটবেন। এ স্থানে অনেকে দৌঁড়ায়। দৌঁড়ানোর কোন বিধান নেই। বাকি জায়গায় স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে উত্তর মাথায় মারওয়ায় যান। মারওয়ার উপরে উঠেও বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'আ করবেন। সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে এক চক্কর হয়। অনেকে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় আসলে এক চক্কর গণনা করে, এটা ভুল। তো সাত সায়ীতে আট বার দুআ করবেন এবং গণনা ঠিক রাখার জন্য তাওয়াফের মত সাত চক্করে পূর্বের সাত তাসবীহ পড়তে পারেন। সায়ীর শেষে দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত। মসজিদেও পড়া যায় মসজিদের বাইরেও পড়া যায়। সায়ীতে তাওয়াফের ন্যায় কোন ইজতিবা নেই। সুতরাং কাঁধ খোলা রাখতে হবে না। এরপর চতুর্দিকে সমান করে মাথার চুল কাটতে হবে। রাস্তার পার্শ্ব থেকে কাটাবেন না। সেলুনে কাটাতে পারেন অথবা মেশিন কিনে নিতে পারেন। তাহলে মাথা যখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সায়ীর পর মাথা মুণ্ডানোর সাথে সাথে আপনি হালাল হয়ে গেলেন। উমরার কাজ শেষ। এখন গোসল ইত্যাদি সেরে সাধারণ পোশাক পরিধান করতে পারেন। এখন আপনি স্বাভাবিক নিয়মে মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেন, দু'আ, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, এবং নফল তাওয়াফ করতে থাকেন। সাথে মহিলা থাকলে নামাযের জন্য তাদেরকে মক্কায় মসজিদুল হারামে বা মদীনায় মসজিদে নববীতে নিবেন না। তারা যেখানে অবস্থান করবে সেখানে নামায পড়াই তাদের জন্য বেশি সওয়াব। তাওয়াফ বা সায়ী করতে গিয়ে অথবা নবীজীর রওজা যিয়ারত করতে গিয়ে নামাযের সময় হয়ে গেলে তখন পড়তে পারে। উভয় মসজিদেই তাদের জন্য নামাযের ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তবে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার জন্য মহিলাদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

হজ্জের বিবরণ

৭ যিলহজ্জের রাতে ইশার নামাযের পর মু'আল্লিমের গাড়ীতে আপনাদেরকে মিনায় নেয়া হবে। ঐ দিন নিজ বাসায় বা মসজিদে গিয়ে পূর্বের নিয়মে ইহরাম বাঁধবেন। অর্থাৎ পাক সাফ হয়ে গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকা'আত নামায পড়ে হজ্জের নিয়ত করবেন। হজ্জের নিয়ত এই–

اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়ত করছি। আপনি সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।

আর বদলী হজ্জ হলে নিয়তের সময় তার নাম উল্লেখ করে বলতে হবে, হে

আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি, আপনি সহজ করে দিন এবং তার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। বাকি সব কাজ এক। নিয়ত করে একবার তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন জরুরী কিছু সামানা সাথে নিয়ে বড় লাগেজ মক্কায় বাসায় রেখে যাবেন।

মিনায় অবস্থান

মুয়াল্লিমের গাড়ীতে মিনায় গিয়ে নির্ধারিত তাঁবুতে অবস্থান করতে থাকেন। যাওয়ার সময় টয়লেটগুলো কোনদিকে খেয়াল করবেন । এরপর তাঁবু থেকে নম্বর দেখে দেখে টয়লেটে যাবেন, যাতে নম্বর মিলিয়ে আবার নিজ তাঁবুতে পৌঁছতে পারেন। তাঁবুর মধ্যে পর্দা টানিয়ে মহিলাদেরকে আলাদা করে দেন। তাদের দরজাও পুরুষদের থেকে ভিন্ন। পর্দার মধ্যে দরজা দেয়া আছে। আট তারিখ সারা দিন মিনায় অবস্থান করুন। খানা-পিনা ও নামায ছাড়া এখানে আর কোন আমল নেই। মুয়াল্লিমকে খানার জন্য টাকা দিলে প্রতি পাঁচ জনের জন্য তিনটা খানার টাকা দিবেন। তিনটা খানা পাঁচ জনে ভালভাবে খাওয়া যায়।

উকূফে আরাফা

আট তারিখ ইশার পর থেকে হাজীদেরকে আরাফায় নেয়া শুরু হয়। সম্ভব হলে আপনি রাতে না গিয়ে ফজরের পর যাবেন। কারণ নবী আলাইহিস সালাম যোহরের আগমুহূর্তে আরাফায় পৌছেছিলেন। বাইতুল্লাহর পূর্বদিকে তিন মাইল দূরে মিনা। গাড়ীতে গেলে সময় বেশি লাগে। আর টিনশেড দিয়ে পায়দল গেলে সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট লাগবে। মিনার ময়দান পাঁচ কিলোমিটার বা তিন মাইল। মিনার সাথে লাগানো আনুমানিক দুইশ হাত দূরে বাতনে মুহাস্সার। যেখানে হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছিল। এরপর থেকে মুযদালিফা শুরু। মুযদালিফাও পাঁচ কিলোমিটার। হাজী বেশি হওয়ার কারণে মুযদালিফার কিছু অংশে তাবু লাগানো আছে। বর্তমানে মিনা মুযদালিফা প্রায় একই সাথে, মাঝখানে কোন ফাঁকা নেই। তবে মুযদলিফা ও আরাফার মাঝে ৫ কিলোমিটার লম্বা একটি খালি ময়দান আছে। সেখানে অনেক টয়লেট বানানো আছে। নিম গাছও আছে। এখানে হজ্জের কোন আমল নেই। এরপর থেকে আরাফা ময়দান শুরু। আরাফা ময়দানও পাঁচ কিলোমিটার।

যাই হোক ৯ তারিখ ফযরের পর আরাফা ময়দানে গিয়ে মুয়াল্লিমের তাবুতে যেখানে খালি জায়গা পান অবস্থান করতে থাকেন। যোহরের আগে গোসল ইত্যাদি সেরে আউয়াল ওয়াক্তে আযান ইকামত দিয়ে শুধু যোহর পড়বেন। যারা মসজিদে নামিরায় আমিরুল হজ্জের সাথে নামায পড়বে তারা যোহর আসর একসাথে পড়বে। আপনি মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কাছে মনে হলেও মূলত তা বহু দূর। রোদ্রে বেশি ঘোরাফেরা করলে হিট স্ট্রোক করতে পারেন। (আল্লাহ না করুন, হিট স্ট্রোকের শিকার হলে ঠাণ্ডা পানিতে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে পুরো শরীরে চেপে ধরে তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন। এসময় সাধারণত জ্বরের ওষুধে কাজ হয় না।) তো আউয়াল ওয়াক্তে যোহর পড়ে আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা যতক্ষণ সম্ভব হয় দাঁড়িয়ে উকূফ করতে থাকুন। নিজ তাঁবুতে অথবা আরাফার ময়দানে প্রচুর নিম গাছ আছে। গাছের ছায়ায় যেখানে ইচ্ছা উকূফ করতে পারেন। উকূফে আরাফা দাঁড়িয়ে শুরু করতে হয়। এরপর প্রয়োজনে বসে বা শুয়ে থাকারও অনুমতি আছে। এখানে আপনাকে মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে সাদাসিধে বিরিয়ানী, ফল এবং জুস দেয়া হবে। তাছাড়া পানি ইত্যাদি সংগ্রহে রাখবেন যাতে প্রচণ্ড গরমে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। খানা-পিনা খেয়ে হানাফী মাযহাব মতে আসরের ওয়াক্তে আসর পরবেন। ঐ দেশের লোকেরা তিনটার সময় আসরের আযান দেয়, তখন পড়বেন না। বেলা ডোবার এক/দেড় ঘণ্টা আগে পড়বেন। নামায পড়ে যিকির-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকবেন। বেলা ডোবার পর মাগরিব না পড়ে মুয়াল্লিমের গাড়ীতে উঠে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবেন। আরাফা এবং মুযদালিফার মাঝখানে শুধুমাত্র পাঁচ কিলোমিটার লম্বা একটি খালি ময়দান। গাড়ীতে গেলে অনেক সময় পৌঁছতে পৌঁছতে ফজর হয়ে যায়। মাগরিব ইশা একসাথে পড়ার সুযোগ হয় না। তাই যুবকদের জন্য হেঁটে যাওয়াই ভালো। এই খালি ময়দানে এক কিলোমিটার পর পর বিরাট সাইনবোর্ড। উপরে লেখা থাকে মুযদালিফা, আর নিচে লেখা ৪ কি. ৩ কি. ২ কি. ১ কি.। এরপরের সাইনবোর্ডে আরবীতে লেখা থাকে মুযদালিফা শুরু। ইংরেজীতে লেখা থাকে মুযদালিফা স্টার্ট হেয়ার। অনেকে এসব সাইনবোর্ডের নীচের লেখার প্রতি লক্ষ্য না করে উপরে মুযদালিফা লেখা দেখে খালি ময়দানে রাত্রি যাপন করে এবং মাগরিব ইশা একসাথে পড়ে। সকালে যখন সামনে অগ্রসর হয়ে দেখে মুযদালিফা শুরু তখন ভুল ভাঙ্গে। এই জন্য না শিখে গেলে হজ্জ বরবাদ হয়ে যায়। তো পাঁচ কিলোমিটার অতিক্রম করে মুযদালিফায় প্রবেশ করে যেখানেই খালি জায়গা পাবেন অবস্থান করবেন। যদি আপনার মিনার তাঁবু মুযদালিফার অংশে পড়ে তাহলে তাঁবুতে অবস্থান করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও এক ইকামতে মাগরিব ও ইশা পড়বেন। মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা এবং এখান থেকে ছোট ছোট কঙ্কর সংগ্রহ করা সুন্নাত। তারপর ফজর নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়ে বেলা ওঠার পূর্ব পর্যন্ত উকূফ করা ওয়াজিব। তবে মহিলা, বৃদ্ধ এবং শিশুরা সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় চলে গেলেও উকূফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মহিলাদের প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে কোন পুরুষ থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও মাফ করে দিবেন। অন্যদের জন্য সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় যেতে হবে। মিনায় গিয়ে বর্তমানে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। এসময় প্রচণ্ড ভিড় থাকে। অনেকে মারাও যায়। খানা পিনা করে বিকালের দিকে যাওয়া ভাল। প্রথম দিন মিনার শেষ মাথায় জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারবেন। মিনার মসজিদে খায়েফের পশ্চিম দিকে সামান্য আগে বাড়লে প্রথমে জামারা সুগরা এরপর জামারা উস্তা এবং সর্বশেষ জামারা আকাবা পড়বে। পাথর মারার জায়গাটা এখন চার পাঁচ তলা বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। দশ তারিখে শুধুমাত্র জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারবেন। এদিন প্রথম দু'টিতে মারা জায়েয নেই। সকল হাজী একই দিনে যেহেতু জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারবে এজন্য দশ তারিখের সুবহে সাদিক থেকে পরবর্তী সুবহে সাদিক পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা সময় রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কোন মাকরূহ সময় নেই। খোঁজখবর নিয়ে যখন দেখবেন কোন ধরনের ঝুঁকি বা প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নেই তখন কঙ্কর মারতে যাবেন। দশ তারিখে মারবেন সাতটা। জামারার বেষ্টনীর যথাসম্ভব নিকটে গিয়ে আরবীতে

باسم الله الله اكبر رغما للشيطان رضا للرحمن

পড়ে অথবা শুধু باسم الله الله اكبر কিংবা বাংলায় 'শয়তানকে অপদস্ত করার জন্য রহমানকে খুশী করার জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করছি' বলে একটা একটা করে কঙ্কর মারবেন। কঙ্কর যেন পিলারের গোড়ায় পড়ে। খাম্বায় লেগে ফিরে এসে যদি বেষ্টনীর বাইরে পড়ে যায় তাহলে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে। তো দশ তারিখ বড় শয়তানকে মারার পর শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে মক্কায় গিয়ে ফরয তাওয়াফ করুন। গাড়িতেও যাওয়া যায়, টিনশেড দিয়ে হেঁটেও যাওয়া যায়। হেঁটে গেলে আরাম বেশি। ফরয তাওয়াফের সময়টা বার তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত বহাল থাকে। মহিলাদের মাসিক শুরু হয়ে গেলে বার তারিখের পরেও করার অনুমতি আছে। কিন্তু পুরুষ যে কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের পরে ফরয তাওয়াফ করলে দম দিতে হবে। ফরয তাওয়াফের সায়ী অগ্রীম না করে থাকলে তাওয়াফের পর সায়ীও করবেন। তাওয়াফ সায়ী করার নিয়ম পূর্বের মতই। কয়েকটা কাজের মধ্যে সিরিয়াল জরুরি। জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারা, কুরবানী করা তারপর মাথা মুণ্ডানো। তামাত্তু এবং কিরানকারীদেরও এই কাজগুলোতে সিরিয়াল ঠিক রাখা আবশ্যক।

ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করবেন না। অর্ডার বেশি থাকার কারণে তারা সময় ঠিক রাখতে পারে না। সবচেয়ে নিরাপদ হলো, কাফেলার যুবকদের পাঠিয়ে সকলের পক্ষ থেকে কুরবানী করে আসা। মিনার ময়দানের এক থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তর পার্শ্বে তাঁবুর শেষ প্রান্তে মুআইসিম নামক পশুর হাটে এবং মক্কার হালাকা বা নাক্কাসা নামক মার্কেটেও কুরবানী দেয়া যায়। তো বড় শয়তানকে মারার পর যুককেরা কুরবানী করে মোবাইলে জানিয়ে দিলে মাথা মুণ্ডাতে পারেন। ফরয তাওয়াফের সাথে মাথা মুণ্ডানোর কোন সম্পর্ক নেই। বরং মাথা মুণ্ডাতে হবে জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারার এবং কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর।

যাই হোক, তাওয়াফ সায়ী করে মিনায় এসে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে থাকেন। দ্বিতীয় দিন কঙ্কর মারার সময় হয় যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর। এদিন সব জামারায় কঙ্কর মারতে হবে। কঙ্কর মারার সময় ভিড় থেকে বাঁচার উপায় হল– জামারার খাম্বাটা পূর্ব-পশ্চিম লম্বা। খাম্বার ডান বা বাম পাশ দিয়ে ভিড় এড়িয়ে পশ্চিম মাথায় গিয়ে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়ান। কেননা নবীজী কঙ্কর মারার সময় দক্ষিণ সাইডে উত্তরমুখী দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় باسم الله الله اكبر رغما للشيطان رضا للرحمن পড়ে প্রথমে জামারা সুগরাতে সাতটি কঙ্কর মেরে সামান্য অগ্রসর হয়ে হাত তুলে দু'আ করুন। একই নিয়মে জামারা উস্তাতেও কঙ্কর মেরে অগ্রসর হয়ে হাত তুলে দু'আ করুন। সর্বশেষ জামারা আকাবাতে কঙ্কর মারার পর দু'আ না করেই চলে যান। দ্বিতীয় দিন তিন জায়গায় সাতটি করে মোট একুশটি কঙ্কর মারা হল। এভাবে তিন দিনে ২১টি করে ৬৩টি এবং প্রথমদিন জামারা আকাবাতে সাতটি মোট ৭০টি কঙ্কর মারা হল। মক্কায় যেহেতু কোন কাজ নেই এজন্য কোন অসুবিধা না থাকলে ১৩ তারিখেও কঙ্কর মারবেন।

বিদায়ী তাওয়াফ

১৩ তারিখ কঙ্কর মারার পর মক্কায় গিয়ে সাথে সাথে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন না। হজ্জের পূর্বে মদীনায় না গেলে হজ্জের পর আপনাকে মদীনায় নেওয়া হবে। আর মদীনায় যাওয়া হয়ে গেলে এখন দেশে ফেরার পালা। মদীনায় যাওয়া বা দেশে ফেরার তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর মক্কা ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে সাধারণ লেবাসে ইহরাম বাঁধা ছাড়াই শুধুমাত্র বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। সায়ী করতে হবে না। বহিরাগতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। উত্তম হল হজ্জের পর যে কয়দিন মক্কায় অবস্থান করবেন প্রতিদিন কমপক্ষে একটা করে নফল তাওয়াফ করবেন। তাহলে মদীনা বা দেশে ফেরার পূর্বে সময় না পেলে শেষের নফল তাওয়াফটাকে বিদায়ী তাওয়াফ হিসাবে গণ্য করা হবে। এসময় কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যায়। ফরয তাওয়াফ কোন অবস্থাতে মাফ হয় না। মাসিকের কারণে যদি কোন মহিলা ফরয তাওয়াফ করতে না পারে এবং মাসিক চলা অবস্থায় তার মদীনা বা দেশে ফেরার সময় হয়ে যায় তাহলে সে খুব ভালোভাবে কাপড় বেঁধে এ অবস্থায়ই তাওয়াফ করবে। এবং ওযর বশত নাপাক অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার কারণে বড় জানোয়ার তথা গরু মহিষ বা উট দ্বারা দম দিতে হবে। ফরয তাওয়াফ ছাড়া দেশে ফিরে আসলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাক হবে না কিন্তু একজন অপর জনের জন্য হালাল থাকবে না। টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে দেশে চলে আসতে পারে। অন্য কোন ব্যক্তি দমের জানোয়ার ক্রয় করে হারামে কুরবানী করলে তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেননা যে কোন দমের সময় সারাজীবন তবে জায়গা নির্দিষ্ট অর্থাৎ হারাম।

বয়ানের সার সংক্ষেপ

হজ্জের ফরয তিনটি: ১. ইহরাম বাঁধা। ২.আরাফার ময়দানে উকূফ করা। ৩. ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ: ১. ৯ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা। ২. ৯ই যিলহজ্জের যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। ৩. মিনায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে কঙ্কর মারা। ৪. কুরবানী করা। ৫. মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের জন্য চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটা। ৬. হজ্জের সায়ী করা। ৭. মীকাতের বাহির থেকে আগমনকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা। হজ্জের ফরযসমূহের কোন একটা ছুটে গেলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। ওয়াজিব ছুটে গেলে হজ্জ বাতিল হবে না তবে দম দিতে হবে।

সর্বশেষ মদীনা বা দেশে ফেরার সময় তাওয়াফের পর অবশ্যই একটা দু'আ করবেন। আরবীতে পড়তে পারলে ভালো অন্যথায় বাংলায় বলবেন اللهم لا تجعل هذا اخر العهد لبيتك (হে আল্লাহ! এটাই যেন (আমার জন্য) তোমার ঘরের শেষ যিয়ারত না হয়)। বার বার যেন আসার তাওফীক পাই। এই দু'আ পড়ে ব্যথা ভরা দিলে চোখের পানি ফেলে বিদায় নিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হজ্জে মাবরূর এবং উমরায়ে মুতাকাব্বালা নসীব করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : ইসমাতুল্লাহ, দারুল ইফতা ২য় বর্ষ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

মুফতীদের জন্য মুতালা'আর বিকল্প নেই

হযরতুল আল্লাম জামীল আহমাদ সাকরোডাবী

দারুল উলূম দেওবন্দের উর্ধ্বতন মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থ প্রণেতা সংক্ষিপ্ত এক সফরে গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া'য় আগমন করেন। তখন স্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও মা'হাদের দারুল ইফতার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 'মুফতীর মুতালা'আ' কেন্দ্রিক সারগর্ভ এক বয়ান পেশ করেন। মুফতীয়ানে কেরাম ও সকল তালিবে ইলমের উপকারার্থে বয়ানটি প্রকাশ করা হল। -সম্পাদক

তাকমীলে ইফতা

আযীয তলাবা! যে বিভাগে আপনারা দরস করছেন দারুল উলূম দেওবন্দে এ বিভাগের নাম তাকমীলে ইফতা, ইফতার তাকমীল। আর তাকমীলে ইফতা বলা হয়, যেহেতু ইতোপূর্বে ছাত্ররা ফিকহের একাধিক কিতাব পড়ে আসে। যেমন- মা-লা-বুদ্দা মিনহু, কুদূরী, নূরুল ঈযাহ, শরহেবেকায়া, হিদায়া ইত্যাদি। স্বভাবতই এতগুলো ফিকহের কিতাবের পাঠগ্রহণের পর ছাত্রদের মধ্যে মাসআলা বলার যোগ্যতা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত এবং হয়েও যায়। কিন্তু এই ইফতা বা মাসআলা বলার পূর্ণতা অর্জন হয় দাওরায়ে হাদীস পড়ার পর। এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক একটা বিভাগ রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন কিতাব পড়ানো, ফাতাওয়া দেয়া ও মাসআলা বলার পদ্ধতি শেখানো হয়। আর এটার নামই হল তাকমীলে ইফতা।

তাকমীলে ইফতা সম্বন্ধে আমি এটুকু বলবো যে, এই বিভাগটি পুরো দারুল উলূম দেওবন্দের সারনির্যাস। অর্থাৎ তাকমীলে ইফতায় ঐ সমস্ত তালিবুল ইলমকে ভর্তি করা হয় যারা দাওরায়ে হাদীস থেকে সর্বোচ্চ নাম্বারে উত্তীর্ণ হয়ে আসে। আরো রয়েছে তাখাসসুস ফিল-হাদীস, তাখাসসুস ফিল আদব, তাকমীলে তাফসীর, তাকমীলে উলূম ইত্যাদি। এ সমস্ত বিভাগ হতে যারা মুমতায (স্টার মার্ক) হয় তাদেরকে তাকমীলে ইফতায় ভর্তি করা হয়। আর তাকমীলে ইফতায় সাধারণত সর্বমোট ৪০/৪১জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। এই চল্লিশ জন ছাত্রকে পুরো দারুল উলূম দেওবন্দের সারনির্যাস গণ্য করা হয়। দারুল উলূম দেওবন্দের আনুমানিক পাঁচ হাজার তালিবুল ইলমের মধ্য হতে এই চল্লিশ জন নির্বাচিত হয়। আর সেখানের একটা কানুন হল, দারুল উলূম দেওবন্দে তাকমীলে ইফতা পূর্ণ করার পর কেউ অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে পারে না। অর্থাৎ তাকমীলে উলূম, তাকমীলে তাফসীর, তাখাসসুস ফিল-হাদীস ইত্যাদি অধ্যয়নের পর তাকমীলে ইফতায় ভর্তি হতে পারে; কিন্তু তাকমীলে ইফতা পূর্ণ করার পর অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে পারে না; কারণ তাকমীলে ইফতা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিভাগ যে, এটা পূর্ণ করার পর অন্য বিভাগে যাওয়া এ বিভাগের জন্য অবমাননাকর। এটা দারুল উলূমের কানুন।

একথাগুলো আমি আপনাদের সামনে এজন্য উপস্থাপন করেছি, যাতে এ বিভাগের গুরুত্ব আপনাদের মনে গেঁথে যায়। এই বিভাগটি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হল, তাকমীলে ইফতা করার পর, দারুল ইফতায় কিছুকাল অবস্থানের পর ঐ তালিবুল ইলম উম্মতের সামনে সঠিক দিকনির্দেশনাসহ উপস্থিত হবে। এই তালিবুল ইলম থেকে সরাসরিভাবে এবং কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়াই উম্মতের ফায়দা হবে। যে তালিবুল ইলম তাকমীলে উলূম করেছে সে যে কোন মাদরাসায় গিয়ে পড়াতে পারে, অনুরূপভাবে যে তাকমীলে তাফসীর করেছে সে-ও মাদরাসায় পড়াতে পারে, তাকমীলে আদব যে করেছে সে-ও পড়াতে পারে অথবা কোন অ্যাম্বেসী ইত্যাদিতে চাকুরী করতে পারে। কিন্তু যে মুফতী হবে তাকে মাদরাসার উস্তাদগণ শুধুমাত্র উম্মতে মুসলিমার জন্য প্রস্তুত করেন। একজন মুফতীই কেবল সাধারণ মুসলমানের মুখোমুখি হয়। যখন কোন ব্যক্তি মুফতী হয়ে যাবে তখন মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে মাসআলা জানতে আসবে, হযরত! এই সমস্যার শরয়ী সমাধান কি? তখন তিনি শরীয়তের বিধান বলবেন, অথবা হযরত! এই ঘটনা ঘটে গেছে; এ ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে? মুফতী সাহেব সেটার সমাধান বলবেন। সুতরাং মাদরাসাসমূহে যে বিভাগটি সরাসরি উম্মতে মুসলিমার জন্য উপকারী সেটা হল দারুল ইফতা তথা তাকমীলে ইফতা। এছাড়া অন্য বিভাগগুলো মুসলিম জনসাধারণের জন্য নয়; সেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য। অন্যান্য বিভাগের তালিবুল ইলম ফারেগ হয়ে অন্য কোন তালিবুল ইলমকে পড়িয়ে দিবে, কিতাব লিখবে ইত্যাদি।

যে বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ তা অর্জন করাও ততোই গুরুত্বের সাথে হওয়া উচিত। মুফতী যদি কোন ভুল মাসআলা বর্ণনা করেন তাহলে বহু লোক সেই মাসআলার উপর আমল করবে। এজন্য মুফতীর জন্য উচিত সঠিক মাসআলা বর্ণনা করা।

মুফতী এবং কাযী (বিচারক)-এর পার্থক্য

কাযীর কাজ হল বিধানাবলী প্রয়োগ করা। আর মুফতীর কাজ হল পূর্বের নির্ধারিত বিধানাবলীকে প্রকাশ করা। এজন্য কাযীর মুখনিঃসৃত সকল কথাই শরীয়তের বিধান হয়ে যায়; তবে শর্ত হল সেটা কুরআন-হাদীসের বিপরীত না হতে হবে। যেমন আপনারা হিদায়া কিতাবে পড়েছেন, যদি কোন নারী কোন পুরুষের ব্যাপারে দাবী করে, এ ব্যক্তি আমার স্বামী; তার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে, পুরুষটি বলল, না, তার সাথে আমার বিবাহ হয়নি, এবার মহিলা বিচারের নিয়মানুযায়ী দুইজন (মিথ্যা) সাক্ষী পেশ করল, সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিল, হ্যাঁ, এ মহিলার বিবাহ এই পুরুষের সাথে হয়েছে; ফলে কাযী ফায়সালা করে দিলেন, মহিলাটি সে পুরুষের স্ত্রী। অথচ দেখুন, সাক্ষীদ্বয় ছিল মিথ্যুক; তবুও কাযীর ফায়সালার কারণে উক্ত মহিলা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে যাবে। এমনকি ঐ ব্যক্তির জন্য মহিলার সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করার ক্ষেত্রেও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বাধা থাকবে না। তাদের সহাবস্থান যিনা-ব্যাভিচার হিসেবে গণ্য হবে না। স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর মহর, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বহন করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কাযী হলেন বিধানাবলী প্রয়োগকারী, শরীয়তের নায়েব এবং শরীয়তের স্থলাভিষিক্ত।

পক্ষান্তরে মুফতী এমন নয় যে, তিনি যা বলবেন তা-ই শরীয়তের বিধান হয়ে

যাবে। মুফতী হল অনুগত; অর্থাৎ পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরাম যে সকল শরয়ী বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন তিনি উম্মতের সামনে সেগুলো প্রকাশ করবেন।

ইসতিফতা হলো, ফাতওয়া বা শরয়ী বিধান জানতে চাওয়া। আর ইফতা হলো, ফাতওয়া বা শরয়ী বিধান প্রকাশ করা। অর্থাৎ মুফতী এরূপ বলে দিবেন, এই সমস্যার সমাধান হল এমন এবং এটা আমি নিজ থেকে বলছি না; বরং ফাতাওয়ার কিতাবে এমনটিই লেখা রয়েছে। মনে করুন, কোন এক ব্যক্তি মুফতী সাহেবকে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি; এখন কী হবে? কোন তালাক পতিত হয়েছে? মুফতী সাহেব উত্তরে বলবেন, তার উপর তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে; স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; বাকী এই স্ত্রীর উপর স্বামীর আর মাত্র দুই তালাকের অধিকার থাকবে। আরো বলবেন, সমাধানটি আমার নয়; বরং নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার অমুক কিতাবে লেখা রয়েছে; যার পাঠ এই...। বোঝা গেল মুফতী সাহেব হলেন ফাতাওয়া প্রকাশকারী।

এক দিক বিবেচনায় মুফতীর জন্য এ কাজ বেশি কঠিন নয়। মস্তিষ্কে তেমন চাপ প্রয়োগ করতে হয় না; মুখস্থ করতে হয় না। তবে অন্যদিক বিচারে এটা খুবই কঠিন কাজ। ফাতাওয়া বিষয়ক কিতাবাদির সংখ্যা হাজার হাজার; মুফতী সাহেবের মেধায় সবগুলো কিতাব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে মাসআলা বের করে বলতে পারা দুরূহ ব্যাপার। মুফতীকে এজন্য অবশ্যই নিয়মিত ফাতাওয়ার কিতাব মুতালা'আ করতে হবে। ফাতাওয়ার কিতাব হল শরয়ী বিধানাবলীর কোষাগার, আর মুতালাআ হল উক্ত কোষাগারের চাবি। যদি মুফতী সাহেব ফাতাওয়া শামী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুতালাআ করেন আর কোন ব্যক্তি মাসআলা জানতে চায় তাহলে তার ধী-শক্তি তৎক্ষণাৎ কিতাবের সেই পাতায় চলে যাবে যেখানে মাসআলাটি রয়েছে। তিনি দ্রুত কিতাব খুলবেন এবং বলে দিবেন। আর যদি মুফতী সাহেব মুতালাআ না করেন তাহলে তার স্মরণশক্তি মাসআলাটি খুঁজে পেতে অক্ষম হয়ে পড়বে। আর যখন স্মরণে আসবে না তখন প্রথমত তিনি পূর্ণ সূচীতে নজর বুলাবেন। ফাতাওয়ার কিতাবসমূহের সূচী অনেক দীর্ঘ হওয়ায় বহু সময় খোঁজার পর মাসআলা বলতে পারবেন। এ কারণে একজন মুফতীর বুনিয়াদী বিষয় হল মুতালাআ। শুধু এজন্যই আমরা দারুল উলূম দেওবন্দে একটি বিভাগ চালু করেছিলাম 'মুতালাআয়ে শামী' নামে। ইফতা পূর্ণ করার পর তিনজন তালিবে ইলমকে উক্ত বিভাগে ভর্তি করা হত দুই বছরের জন্য; দুই বছরে পূর্ণ শামীর মুতালাআ করানো হত। কমপক্ষে একটি কিতাব তো মুতালাআ হওয়া উচিত। একটি কিতাব মুতালাআ হয়ে গেলে অন্যান্য কিতাবগুলোতেও সেই ইবারত তাকরার হয়ে যায়; সেখানেও প্রায় একই মাসআলা।

আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর কিতাবে যে সকল মাসআলা রয়েছে তা আপনারা পড়েছেন। কাওয়াইদুল ফিকহে যেসব নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে তা-ও কঠিন কিছু নয়। উদাহরণত 'আল-উমূরু বি-মাকাসিদিহা' একটি মূলনীতি। এর মর্মকথা হল 'হুকমুল উমূরি বি-মাকাসিদিহা'। অর্থাৎ যে বিধান আরোপিত হবে তা সমস্যার শিকার ব্যক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আরোপিত হবে। অতএব শরীয়তের বিধান বাহ্যিক অবস্থা দেখে বলা যাবে না; বরং সমস্যার শিকার ব্যক্তির উদ্দেশ্য বুঝে ফায়সালা করতে হবে। উদাহরণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছে। স্ত্রী বলল, আজ আমি বাড়ি যেতে চাই। স্বামী বলল, আজকে নয়। স্ত্রী বলল, আমি যাবই। স্বামী বলল, আজ যাওয়াই যাবে না। বাদানুবাদ চলতে চলতে স্বামী রেগে গিয়ে বলল, যদি তুমি বের হও তাহলে তুমি তালাক। ব্যস, এ পর্যন্তই। এর দশ বছর পর স্ত্রী ঘর থেকে বের হল। বাহ্যিক শব্দাবলীর চাহিদা হল, দশ বছর পরও যদি বের হয় তাহলে তালাক পতিত হবে। কিন্তু মুফতী বলবেন, এমনটি নয়; বরং উক্ত ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সেটা হল, স্ত্রী বলেছিল, আমি এখনই যাব। আর স্বামী বলেছিল, তুমি এখন যেতে পারবে না; এখন গেলে তালাক। সুতরাং ঐ সময় যেহেতু স্ত্রী ঘর হতে বের হয়নি, কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কাপড় পরিষ্কার, রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজে লেগে গিয়েছিল, তারপর সন্ধ্যায়ই ঘর হতে বের হয়েছিল তবুও তালাক পতিত হবে না। এখানে বিধান আরোপ করা হয়েছে মাকসাদের দিকে লক্ষ্য রেখে; বাহ্যিক শব্দাবলী শুনে বিধান আরোপিত হয়নি।

আপনারা হয়ত পড়ে থাকবেন, উকূদ এবং ফুসূখের মধ্যে মা'আনী তথা নিয়ত এবং মাকসাদ তথা উদ্দেশ্য ধর্তব্য হয়; বাহ্যিক শব্দাবলী নয়। একটি উদাহরণ দেখুন, একব্যক্তি নাপাক অবস্থায় কুরআনে বর্ণিত দু'আ 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া...' পড়ল আর দু'আ করার পূর্বে ছানা হিসেবে সূরা ফাতিহা পড়ল অথবা কোন বাচ্চাকে দম করার জন্য সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ল, তাহলে কি সে গুনাহগার হবে? না, হবে না। গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি গোসল না করে কুরআন উচ্চারণ করলে কেবল তখনই গুনাহগার হবে যখন সে কুরআনে কারীম পাঠ করবে তিলাওয়াতের নিয়তে। আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সে তিলাওয়াতের নিয়তে পড়েনি; বরং দু'আ বা ছানা হিসেবে পড়েছে। আপনারা আল-উমূরু... এই মূলনীতির মর্ম বুঝতে পারলেন যে, ব্যক্তির নিয়ত ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার বিধান হবে।

পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দাবলীও মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; বক্তার নিয়ত ধর্তব্য হয় না। যেমন, জনৈকা মহিলা জনৈক পুরুষকে বলল, আমি নিজেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে তোমার মালিকানায় সোপর্দ করলাম। পুরুষ লোকটি বলল, আমি গ্রহণ করলাম। দুইজন পুরুষ তাদের কথোপকথন শুনে ফেলল। তাহলে তাদের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। অথচ তাদের কথায় 'বিবাহ' শব্দটির গন্ধই নেই। বোঝা গেল, দারুল ইফতায় যে সকল কিতাব রয়েছে তা বোঝা কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। আমিও কাওয়াইদুল ফিকহ পড়াই। ইফতা বিভাগে তুলনামূলক কঠিন কিতাব হল সিরাজী। আর সিরাজী তো তালিবুল ইলম পূর্বেই (শরহেবেকায়া শ্রেণীতে) পাঠ করে ফেলে। সুতরাং সেটাও তখন কঠিন থাকে না।

মূলত ইফতা বিভাগের এই নিসাব (পাঠ্যক্রম) কঠিন কিছু নয়। কঠিন কাজ হল, তালিবুল ইলমের নযর ফুরূ' এবং জুযইয়াত এর উপর হওয়া উচিত; যখনই তার সামনে কোন মাসআলা আসবে তাৎক্ষণিক তার মাথায় আসবে, এই মাসআলাটি কোথায় পাওয়া যাবে। যদি কোন তালিবুল ইলমের মধ্যে এই যোগ্যতা অর্জন হয়ে যায় তাহলে সেই হবে সফল মুফতী। যদি তা না হয় তাহলে সে সফল মুফতী নয়। সে পেরেশানীতে পড়ে যাবে। কেননা সে প্রথমে কিতাবসমূহের সূচীপত্রের সুবিশাল ময়দান অতিক্রম করবে, তারপর মাসআলা খুঁজে বের করবে, এরপর

লিখবে। কেননা আজকাল প্রশ্নকারীরা হাওয়ালা তথা উদ্ধৃতি ছাড়া কোন মাসআলা মানতে চায় না।

আরো একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল, মুফতীর জন্য দলীল পেশ করা ওয়াজিব নয়, সুন্নাতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। এমনকি মুফতীর কর্তব্যের মধ্যেও দলীলের বিষয়টি আসে না। কারণ, মুফতী সাহেব তো ফাতাওয়া তথা বিধান প্রকাশকারী। তিনি এটা বলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন যে, এটা তো ফাতাওয়া শামীতে রয়েছে; আমি এর দলীল জানি না, এটা আল-বাহরুর রায়িক কিতাবে লেখা আছে; তবে এর দলীল কী, সেটা আমি জানি না। অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী মহান উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গগণ এ সমস্যার সমাধান এমনটিই লিখেছেন; আমি এর নাড়িনক্ষত্র জানি না। মোটকথা, দলীল পেশ করা মুফতীর দায়িত্ব নয়। মুফতীর দায়িত্ব হল, হাওয়ালা তথা উদ্ধৃতি পেশ করা। এটা মুফতীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। আজকের এই যামানা পর্যন্ত যে পরিমাণ ফাতাওয়ার প্রয়োজন ছিল সবই দেয়া ও লেখা হয়ে গেছে। ফাতাওয়া শামী, আল-বাহরুর রায়িক এগুলো ফাতাওয়ার কিতাব। অর্থাৎ সমস্ত ফাতাওয়া তো প্রস্তুত হয়েই গেছে। মুফতী শুধু এটুকুই বলবেন যে, আল-বাহরুর রায়িক কিতাবে এটা লেখা রয়েছে। আর আল-বাহরুর রায়িক আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য কিতাব; এর মাঝে যা কিছু লেখা রয়েছে তা পরিপূর্ণ সঠিক বলে বিবেচিত। বোঝা গেল, মুফতীর দলীল পেশ করা কর্তব্য নয়; বরং হাওয়ালা পেশ করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে কাযীর জন্য দলীল বর্ণনা করা জরুরী। তিনি কুরআন থেকে দলীল পেশ করবেন। সেখানে না পাওয়া গেলে হাদীস থেকে, তা না হলে ইজমা থেকে, তা-ও যদি না হয় তাহলে কিয়াস তথা ইজতিহাদ থেকে দলীল বর্ণনা করবেন; কাজেই কাযীর জন্য মুজতাহিদ হওয়াও আবশ্যক; এজন্য কাযীর দরবারে যদি এমন কোন মামলা-মোকদ্দমা এসে যায় যা হানাফী কিতাবসমূহে নেই; কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনে কারীমের মধ্যে নেই, সুন্নাতে রাসূল তথা হাদীসের মধ্যে নেই, ইজমায়ে উম্মতের মধ্যে নেই, এমনকি বর্তমানের মুদ্রিত কোন কিতাবের মধ্যেও নেই। অথচ কাযীর জন্য ফায়সালা দেয়া ওয়াজিব। এ সময় কাযী ফায়সালা দেয়ার জন্য ইজতিহাদ করবেন। অর্থাৎ অন্য একটি মাসআলার উপর 'হামলুন নাযীর আলান-নাযীর' করবেন, কিয়াস করবেন। অতঃপর তিনি মাসআলা বলবেন। পক্ষান্তরে দলীল পেশ করা মুফতীর যিম্মাদারী নয়; তার যিম্মাদারী হল হাওয়ালা পেশ করা।

বর্তমান যামানায় এক গ্রুপ (গাইরে মুকাল্লিদ/ আহলে হাদীস) একথা বলেন যে, ফাতাওয়া দেয়ার প্রয়োজন কি! প্রত্যেকে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল দেখে আমল করবে; এ দু'টিই তো মূল। এ কথার জবাব আপনারা এভাবে দিবেন, নিঃসন্দেহে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলই মূল, আর এ দু'টির সাহায্যে ফাতাওয়া দেয়া উচিত, এ দু'টি দেখেই আমল করা উচিত; কিন্তু বর্তমানে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম ব্যক্তি কয়জন রয়েছে? আমার মতে লাখের মধ্যে একজনও নেই; বরং এক কোটিতেও একজন নেই যিনি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল থেকে সঠিকভাবে মাসআলা বের করতে এবং সেমতে আমল করতে সক্ষম। আর যখন এমন কেউ নেই তখন কোন না কোন মুজতাহিদের উপর আস্থা তো রাখতে হবে। এজন্যই আমরা বলি যে, তাকলীদ এবং ইজতিহাদ হল, মুকাল্লিদ কর্তৃক কোন ইমামের রায়ের উপর আস্থা রাখা। অর্থাৎ কোন ইমামের রায়ের উপর আস্থপা রাখার নাম তাকলীদ। উদাহরণস্বরূপ, আমি হানাফী; আমি একটি আমল করেছি। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, আপনি এমন কেন করলেন? তখন আমি জবাবে বলব, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এমনটি বলেছেন। এখানে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নাম উচ্চারণের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি শরীয়ত প্রণেতা। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এই মাসআলাটি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের আলোকে বর্ণনা করেছেন আর আমরা তার রায় এবং ইজতিহাদের উপর আস্থা রাখি। যেমন কুরআনে কারীমের আয়াত وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء.। আপনারা নূরুল আনওয়ারে পড়েছেন, হানাফী মাযহাবে قرء শব্দের উদ্দেশ্য হায়েয বলা হয়। আর শাফেয়ী মাযহাবে পবিত্রতা উদ্দেশ্য নেয়া হয়। এর কারণ কি? এর কারণ হল, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টিই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন। প্রশ্ন হবে তাহলে আপনারা হানাফীরা করউন শব্দের দুটো অর্থ থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করে একটা অর্থ কেন বলেন? এর জবাবে আপনারা বলতে পারেন যে, আমাদের ইমাম করউন এর অর্থ বলেছেন হায়েয, আর আমরা তার উপর আস্থা রাখি। ইমাম শাফেয়ী রহ. করউন এর অর্থ বলেছেন পবিত্রতা, আর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীরা তার কথার উপর আস্থা রাখে। বোঝা গেল, মুজতাহিদের রায়ের উপর আস্থা রাখার নাম তাকলীদ।

ই'তিমাদ তথা আস্থা তো কারো না কারো মতের উপর রাখা জরুরী। প্রত্যেক ব্যক্তিই আস্থা রাখে। কিন্তু আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে আপনি যখন মাসআলা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তারা 'ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া' থেকে আপনাকে জবাব দেবেন। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, ভাই! আপনারা ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া থেকে কেন ফাতাওয়া দিয়েছেন? তখন তারা বলবে, আমরা ইবনে তাইমিয়ার ফাতাওয়ার উপর আস্থা রাখি। আচ্ছা, তোমরা ছোট ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা রাখো এটা তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য; আর আমরা বড় ব্যক্তিত্বের উপর, প্রখ্যাত তাবেয়ী ও রাসূলের ঘোষিত উত্তম যুগের হযরত আবূ হানীফা রহ. এর উপর আস্থা করি সেটা গ্রহণযোগ্য নয়! এটা কেমন কথা? বোঝা গেল তারাও মুকাল্লিদ; কেননা তারা ইবনে তাইমিয়ার তাকলীদ করে। আমরাও মুকাল্লিদ। কিন্তু তারা মুকাল্লিদ মুকাল্লিদ বুলি আওড়িয়ে আমাদের বদনাম করে থাকে। কথায় আছে, মিথ্যা এ পরিমাণ বলবে যাতে মানুষ সত্য মনে করতে শুরু করে। গাইরে মুকাল্লিদরা তাকলীদ প্রসঙ্গে আমাদের বদনাম করে। কিন্তু আমরা যদি তাদের বিপক্ষে বলতে থাকি তাহলে তারা দলীল-প্রমাণে কোন দিন কোথাও আমাদের সাথে পাত্তা পাবে না। মোটকথা, আস্থা সকলেই রাখতে বাধ্য; কেউ ছোট ব্যক্তিত্বের বা খাইরুল কুরূন তথা উত্তম যুগের মহাজ্ঞানীজনকে বাদ দিয়ে হালযামানার সলীমুদ্দীন-কলিমুদ্দীনের উপর আস্থা রাখে আর কেউ বড় ব্যক্তিত্বের উপর।

হযরত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যে ইজতিহাদ করেছেন এটা শরীয়ত পরিপন্থী কোন বিষয় নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও ইজতিহাদ ছিল; এটা কোন নতুন আবিষ্কৃত বিষয় নয়। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে

কেরাম রাযি. কে বললেন, আজ বনূ কুরাইযা অবরোধ করতে হবে; আসরের নামায বনূ কুরাইযায় পৌঁছে আদায় করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যে আসর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেল। কিছু সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা নামায এখানে রাস্তায় পড়ে নিব। বাকীরা বললেন, না! আমরা বনূ কুরাইযায় পৌঁছেই পড়ব। অর্থাৎ দ্বিতীয় জামা'আত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বাহ্যিক শব্দাবলীর উপর আমল করেছেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা আসর নামায বনূ কুরাইযায় পৌঁছে আদায় করবে। আর যারা পথিমধ্যেই আসর নামায আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা বললেন, আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও আসরের নামায বনূ কুরাইযায় পৌঁছে পড়বে; বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল, দ্রুত পথ অতিক্রম করা যাতে আসর নামাযের পূর্বেই বনূ কুরাইযায় পৌঁছে আসরের নামায আদায় করি। কিন্তু যখন পথিমধ্যেই আসর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল তখন আমরা রাস্তায়ই আসর পড়ে নিব। এক জামাআত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক কথার উপর আমল করেছেন এবং অন্য জামাআত তাঁর কথার মর্মের উপর আমল করেছেন।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ঘটনা পেশ করা হল যে, কিছু সাহাবায়ে কেরাম এখানে নামায পড়েছেন এবং কিছু সাহাবায়ে কেরাম ওখানে পড়েছেন। তখন তিনি কোন জামাআতকে প্রত্যাখান করেননি এবং কোন জামাআতকে নামায পুনরায় আদায় করার জন্যও বলেননি। নবীজীর উদ্দেশ্য এটাই যে, উভয় গ্রুপের নামায আদায় সহীহ হয়েছে। বোঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন। কাজেই সে যামানায়ও ইজতিহাদের উপস্থিতি বহাল ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সত্যায়ন করেছেন এবং সঠিক বলেছেন। সুতরাং বর্তমান যুগেও ইজতিহাদকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. কে ইয়ামানের গভর্ণর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। যখন তাকে বিদায় দিবেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মু'আয! ইয়ামানে যাচ্ছো, লোকেরা তোমার নিকট মামলা-মুকদ্দমা নিয়ে আসবে তখন তুমি কিসের মাধ্যমে ফায়সালা দিবে? মু'আয রাযি. বললেন, কিতাবুল্লাহ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে ফায়সালা না পাও? তিনি বললেন, তাহলে রাসূলের সুন্নাত দ্বারা। আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে কোন বিধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার রায় (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) এর মাধ্যমে ইজতিহাদ তথা কিয়াস করবো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সঠিক স্থির করলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার যিনি তাঁর রাসূলের প্রেরিত দূতকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিজনক কাজের তাওফীক দান করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, ইজতিহাদের উপর আল্লাহর রাসূল খুশী ছিলেন। অথচ গাইরে মুকাল্লিদরা এর উপর খুশী নয়। এরা মুহাদ্দিস নয়; মুহদাস (বিদআতী)। আল্লাহর রাসূল ইজতিহাদের উপর খুশী হলেও গাইরে মুকাল্লিদরা খুশী নয়। অতএব এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া আমাদের কর্তব্য। তাদেরকে এটাও বলে দেয়া উচিত যে, যদি বাস্তবিকই এটার উপর আমল করার জন্য তোমরা বাধ্য হও তাহলে সূরা ويل لكم همزة... এর তরজমা করে দেখাও। যে ব্যক্তি ويل لكل همزة... এর তরজমা করতে পারে না সে এর তাফসীর করতে পারবে? আর যে ويل لكم همزة... এর তাফসীর করতে পারে না সে এর থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত করতে পারবে? কখনোই পারবে না। অতএব স্পষ্ট কথা হল, তাকে কারো না কারো ইজতিহাদ এবং ইসতিম্বাতের উপর আস্থা রাখতে হবে। আর প্রত্যেকেই যেহেতু আস্থা রাখে, সুতরাং সকলেই মুকাল্লিদ। সকলেই মুকাল্লিদ এজন্য যে, একজন সাধারণ মুসলমান আপনার নিকট এসে মাসআলা জানতে চাইল; আপনি তার জবাব দিয়ে দিলেন। জবাব শুনে সে চলে গেল এবং সে অনুযায়ী আমল করল। এখন বলুন, ঐ ব্যক্তি যে আপনার বর্ণিত মাসআলার উপর আমল করল সে-তো আপনার উপর আস্থা রেখেছে। অর্থাৎ সে বিশ্বাস করেছে যে, মুফতী সাহেব যে মাসআলা আমাকে বলেছেন সেটা একেবারে নির্ভুল। সুতরাং নির্ভরশীল হতেই হবে। নির্ভর করা কিংবা আস্থা রাখা ব্যতিরেকে তো কিছুই হয় না।

অতএব তাকলীদ বলা হয়, একজন মুকাল্লিদ কোন ইমামের রায়ের উপর– যা তিনি ইজতিহাদ এবং ইসতিম্বাত করেছেন– তার উপর ভরসা করাকে। আর এই ইসতিম্বাত এবং ইজতিহাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও বহাল ছিল। কিন্তু সে যামানায় কার্যত ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখন শরীয়ত প্রণেতা পয়গম্বর তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। কারো কোন মাসআলা প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থাপন করা হত, তিনি তার জবাব দিয়ে দিতেন। তখন এমন ছিল যে, এক ব্যক্তি হুযূরের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, হুযূর! উযূ কিভাবে করব? তিনি পানির পাত্র চাইলেন, উযূ করলেন এবং উযূর শেষে বললেন, هذا وضوئى (এই হল আমার উযূ), ব্যস। হযরত আলী রাযি. কে এক সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাসূলের উযূ কেমন ছিল? আলী রাযি. পানির পাত্র চাইলেন। এরপর উযূ করলেন এবং শেষে বললেন, هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে উযূ করতেন)।

সে যামানায় জনসংখ্যা বেশি না থাকায় ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন, লোকদেরকে দীনের দিকে আহ্বান করলেন, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি দেশের মানুষ মুসলমান হতে লাগল, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে কোন একজন ব্যক্তি থেকে মাসআলা জানা সম্ভব হতো না তখন এ বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দিল যে, মাসআলা-মাসাইল ইসতিম্বাত-ইসতিখরাজ করে নীতি অনুসারে সুবিন্যস্ত করা হবে, যাতে উম্মতের জন্য উপকৃত হওয়া সহজ হয়ে যায়। সুতরাং এ কাজের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. কূফায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ফিকহ এবং ফাতাওয়ার কাজ আঞ্জাম দেয়া শুরু করলেন। সেখান থেকে ফাতাওয়া-মাসাইলের একটা বড় ভাণ্ডার প্রস্তুত হয়ে গেল। তার শাগরেদ এবং ফাতাওয়া এত বৃদ্ধি পেল যে, একবার হযরত আলী

রাযি. কূফায় এসে দেখলেন যে, এই মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদ, ঐ মসজিদের খতীব আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদ, এই মাদরাসার মুদাররিস আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদ, ঐ দারুল ইফতার মুফতী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদ, চারদিকে শুধু ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদ, তখন হযরত আলী রাযি. বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর শাগরেদগণ এই শহরের প্রদীপ; তারা এ শহরকে আলোকিত করে রেখেছে।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. উলূমে দীনিয়্যার এত বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর ইন্তিকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হলেন হযরত আলকামা রাযি.; তিনি এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তার ইন্তিকালের পর এই দায়িত্ব ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর নিকট গেল; তিনিও এই খিদমত আঞ্জাম দিলেন। ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর পর হাম্মাদ রহ. এর নিকট চলে গেল; তিনি এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন। হাম্মাদ রহ. এর ইন্তিকালের পর এ দায়িত্ব হযরত আবূ হানীফা রহ. এর নিকট চলে আসল; তিনি এ খিদমত আঞ্জাম দিলেন। তিনি মাসআলা ইসতিম্বাত-ইসতিখরাজ করলেন।

অপরদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ইজতিহাদের উপর হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. আস্থা রাখেন। যেমনিভাবে হানাফী মাযহাবের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি., তেমনিভাবে শাফেয়ী মাযহাবেরও সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.। মালেকী মাযহাবের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.।

মোটকথা, ইজতিহাদ এবং ইসতিম্বাত অপ্রয়োজনীয় এবং বে-ফায়দা কোন বিষয় নয়; বরং উম্মতের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। মাসআলা-মাসাইল সর্বদা ইসতিম্বাত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যদি কারো মাঝে এই যোগ্যতা পাওয়া যায় তাহলে তার জন্যও ইসতিম্বাত-ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানেও যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যা কোন কিতাবে নেই তাহলে ফিকহী সেমিনার করা হয়। মুফতীয়ানে কেরাম এবং উলামায়ে কেরাম সকলে মিলে বৈঠক করেন, চিন্তা-ফিকির করেন, এই সমস্যার শরয়ী বিধান কী হওয়া উচিত, কেমন বিধান না হওয়া উচিত।

এটাই ইফতার সারকথা। এ ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদদের ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে নিজেদেরকে ভীষণভাবে উপস্থাপন করা উচিত। আমাদের মাঝে বর্তমানে ইলমে হাদীসের চর্চা কমে গেছে। পক্ষান্তরে তারা দু-চারটি হাদীস মুখস্থ করে নেয়, আর হোটেলে বা ফার্মেসীতে গিয়ে বলে যে, দেখুন, ইমাম মুসলিম রহ. এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফ, বুখারীর পরেই যার স্থান; সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি– এসব বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে বলে, এর মধ্যে রয়েছে এ হাদীস; অথচ হানাফীরা এ অনুযায়ী আমল করে না। এভাবে একজন ডাক্তার– যে ডাক্তারী বিদ্যায় অভিজ্ঞ হলেও নূরানী কায়েদা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না– সে ওই প্ররোচনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয় এবং বলে, কথা তো ঠিক; কারণ মুসলিম শরীফের হাদীস! আল্লাহর রাসূলের হাদীস! বুখারী শরীফের হাদীস! অথচ হানাফীরা এর বিপরীত আমল করছে!!

এসব কথার জবাব আমাদের জানা থাকা উচিত। এর জবাব হল, মুসলিম শরীফের যে হাদীসটি ডাক্তার সাহেবের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা সহীহ; তবে এর উপর আমল প্রমাণিত না হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত দেখতে হবে, হাদীসটি মানসূখ (রহিত) কি না? এক্ষেত্রে তার নাসিখ (রহিতকারী বর্ণনা) খুঁজতে হবে। যখন নাসিখ পাওয়া যাবে তখন ডাক্তার সাহেবকে বলতে হবে, এটা ইসলামের শুরু যামানার বিধান; পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা নাসিখ তথা রহিতকারী হাদীসের উপর আমল করি; মানসূখ তথা রহিত হাদীসের উপর নয়। তাকে আরও বলতে হবে, যখন একজন রোগী আপনার নিকট প্রথমবার এসে কয়েকদিন আপনার দেয়া চিকিৎসা গ্রহণ করে কোন উপকার না হয়, তখন আপনি তার ওষুধ পরিবর্তন করে দেন। এই প্রথমবারের ওষুধ মানসূখ আর পরের ওষুধ নাসিখ; এখন রোগীর জন্য প্রথমবারের ওষুধ না খাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত তাকে বলতে হবে, মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে হাদীস। কিন্তু অন্য একটি হাদীস এর বিপরীতে রাজেহ তথা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। যদি দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে যেকোন একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তারজীহের কারণ বর্ণনা করা জরুরী।

তৃতীয়ত হাদীসের সঠিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হবে। বলতে হবে, হাদীসটির আপনারা যে অর্থ বলেছেন তা সঠিক নয়; বরং হানাফী মাযহাবের আমলের অনুরূপ অর্থটাই সহীহ। উদাহরণস্বরূপ বলতে হবে, ইদ্দত হল তিন হায়েয পরিমাণ সময়। আর করউন শব্দের অর্থ হায়েয; পবিত্রতা নয়। সাথে সাথে তারজীহের কারণও বর্ণনা করতে হবে। তারজীহের কারণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে হবে যে, এই মর্মটি বেশি উত্তম। মোটকথা জবাব দেয়ার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হল, আমাদের এগুলো জানা থাকতে হবে। যখন কোন জ্ঞানী লোক কোন মুফতীর কাছ থেকে এ পদ্ধতিগুলোর আলোকে প্রদত্ত মাসআলা জানতে পারবে তখন নিশ্চিন্তে সে তা গ্রহণ করবে। জ্ঞানী লোকের সামনে যৌক্তিক আলোচনা করা হলে তারা সহজেই গ্রহণ করে। এটাই দারুল ইফতার তালিবুল ইলমের যিম্মাদারী।

দারুল ইফতার তালিবুল ইলমের এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করা জরুরী। বর্তমান যামানায় তালিবুল ইলমের প্রথম কাজ ফাতাওয়ার কিতাবসমূহের উপর দৃষ্টি রাখা। শরীয়তের যে বিধানই সে বর্ণনা করবে তার উৎস কিতাব হতে হবে এবং হাওয়ালা (তথ্যসূত্র) উল্লেখ করতে হবে। হাওয়ালা উল্লেখ করার পর সে দায়িত্বমুক্ত। এখন যদি কোন গাইরে মুকাল্লিদ বাহাস-মুবাহাসা করে তাহলে তার জবাবের জন্য হাদীস জানা থাকতে হবে। তারা যে হাদীস বর্ণনা করে থাকে তার জবাব জানা থাকতে হবে। এসব জানা না থাকলে আমাদের জন্য তাদের জবাব দেয়া দুরূহ হবে।

বর্তমানে আমাদেরকে বলা হয়, হানাফীদের কোন হাদীস জানা নেই। অথচ হানাফীদের যত হাদীস জানা আছে গাইরে মুকাল্লিদদের গুরুদেরও তত হাদীস জানা নেই। তাদের তো বুখারী এবং মুসলিমের হাদীস জানা আছে। কিন্তু হানাফীদের বাইহাকী, বায্‌যায, বায্‌যার ইত্যাদির হাদীসও জানা আছে। এছাড়াও বহু হাদীসগ্রন্থের হাদীস আমাদের জানা রয়েছে। কিন্তু একথা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মুতালাআর ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। আমাদের দূরদর্শী হওয়া উচিত। যেমন আমরা হিদায়া পাঠ করি এবং পাঠদান করি। হিদায়া কিতাবে তো হাদীস খুবই কম। তারা বলে যে, হিদায়াপ্রণেতা হাদীস জানতেনই না। যদি জানতেন তাহলে বর্ণনা করতেন।

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

ইসলামী শিরোনাম মানেই কি বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চা!

মুফতী হাফিজুর রহমান

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। প্রভুর আনুগত্যই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রাণশক্তি। তাই মানব সমাজের জীবন চর্চার পুরোটাই নৈতিকতার পবিত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার কোনো পর্বই ইসলামী শরীয়ার নীতি বহির্গত নয়। সাংস্কৃতিক কিংবা উৎসব অনুরাগী শিরোনামে মুসলিম ব্যক্তি সত্তার কোনো আচরণই স্বতন্ত্র হতে পারে না। হাদীসের ভাষ্য মতে পবিত্র ঈমানের ধারক ব্যক্তি প্রবঞ্চনার দ্বিমুখিতা অনুশীলন করতে পারে না। একজন সচেতন মুসলিম ব্যক্তি নামের ছদ্মাবরণে আদৌ প্রবঞ্চিত হতে পারে না। হাদীসের নির্দেশনা মতে এ ব্যাপারটিতে সে সচকিত ও সবিশেষ যত্নবান হতে বাধ্য। সাধারণত একজন মুসলিম তার সহজাত পবিত্র অভিরুচির তাড়নায় ইসলামী বিষয়াবলীতে বিশেষ আগ্রহ লালন করে। তার ব্যক্তি চর্চার ধরণ যাই হোক- দীনী বিধান পরিপালনের আবশ্যকতাকে সে অকপটে স্বীকৃতি দেয়। নৈতিক আনুগত্য-অনুসরণকে মর্যাদার মনে করে। মুসলিমদের সহজাত এ পবিত্র দুর্বলতার ছিদ্রপথে ঢুকে পড়েছে অসংখ্য অভিনব কুসংস্কার। স্বার্থচিন্তার সবটুকু প্রয়োগ প্রাধান্য পাচ্ছে এ জায়গাটিতে। রাজধানীর অলিতে গলিতে ইসলামী নামের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। আপামর জনসাধারণও সাইনবোর্ডের এ পরোক্ষ আহ্বানের মায়াজালে জড়িয়ে যাচ্ছে খুব সহজেই। মুসলিম সাধারণের পবিত্র এ ঝোঁক প্রবণতা ও সারল্যকে পুঁজি করে ইসলামী শিরোনামে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়গুলোর ইসলামী সার্থকতার সরল বিশ্লেষণ নিয়েই এ নিবন্ধের অবতারণা।

ইসলামী গান বা ইসলামী সঙ্গীত

গান শব্দটির শব্দগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষনে আমরা যাবো না। পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাগুলোতে শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ আর পারিভাষিক অর্থ সর্বদাই এক ও অভিন্ন হয় না। দু'টি অর্থের মাঝে কদাচিৎ সুপ্ত ঘনিষ্ঠতা দেখা গেলেও একটি অন্যটির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়। বাংলা পরিভাষায় গান বলতে বুঝায় বাদ্যযুক্ত ললিত ধ্বনি। ভার্সিটিগুলোতে গান চর্চার নিমিত্ত ললিত কলা নামে স্বতন্ত্র্য বিভাগও বিদ্যমান। অভিধানগুলোতে এর অর্থ করা হয়েছে, গীতিকবিতা ও কণ্ঠসঙ্গীত। নৃত্য ও বাদ্যের সাথে গীতি বা সঙ্গীতের সাযুজ্য তো আরো প্রকট। চারুকলা বা ললিতকলা শাস্ত্রে সঙ্গীতের সংজ্ঞায়ন হয়েছে এভাবে- গীত, বাদ্য ও নৃত্য এ তিনটি ক্রিয়া একত্রে নিষ্পন্ন হলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় শাস্ত্রমতে তাকেই সঙ্গীত বলে। সুতরাং শাস্ত্রীয় এ পরিভাষা লঙ্ঘনের আপাতত সুযোগ নেই। অতএব নৃত্যবাদ্যহীন গজলকে সঙ্গীত বলে চালনা করা কি নীতি সিদ্ধ? শুরুতে ইসলামী শিরোনাম যুক্ত হলেই কি সঙ্গীত থেকে নৃত্যবাদ্য ঝরে যাবে? বহুল প্রচলিত একটি শাস্ত্রীয় পরিভাষা নিছক একটি পবিত্র শিরোনাম যুক্তকরণেই কি পবিত্র হয়ে যাবে? ইসলামী সঙ্গীত বা ইসলামী গান শব্দদু'টি ব্যবহারের পূর্বে এসব বিষয় নিয়ে খানিকটা বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। উন্মুক্ত শিল্পবোধ বা শৈল্পিক চেতনার নামে যাচ্ছেতাই বলা বা করা যায় না। অন্তত ইলমঘনিষ্ট মানুষদের এ জায়গাটিতে সচেতন হওয়া খুব বেশি প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক ইলমী ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে তুমুল আলোচিত একটি প্রসঙ্গ। পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। বস্তুত কালের প্রয়োজনে প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা সত্যিই অসামান্য। এ ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কারো কাম্য নয়। তবে ইসলাম বা শরীয়া অনুসরণে অবহেলা করে এ নামের ব্যবহারে উলামায়ে কেরাম ঘোর আপত্তি করতে বাধ্য। অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালনে বেশ পরিপক্বতা দেখায়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তার কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন বা অনুশীলন দেখা যায় না। মূল কার্যক্ষেত্রে গিয়ে তারা সুদ-মুনাফার ব্যবধানকে ঘুচিয়ে ফেলেন। এসব বাস্তবতা বিবেচনায় উলামায়ে কেরাম যখন ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন তখন তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকের বিরোধী পক্ষ বলে জ্ঞান করা হয় কিংবা ব্যাংক-অর্থনীতি বিষয়ে তাদের জ্ঞানের পক্বতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ ইসলামী ব্যাংকগুলোর পুরোধা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ থেকেই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো শতভাগ সুদমুক্ত নয় এবং সুদমুক্ত করা সম্ভবও নয়। অনেকে প্রসঙ্গ এড়াতে বলেন, আপনি কি শতভাগ গুনাহমুক্ত? তা না হলে ইসলামী ব্যাংকের শতভাগ সুদ মুক্তির প্রসঙ্গ তোলেন কেন? এই প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। কারণ, ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক অপরাধ আর ব্যক্তিজীবন ছাপিয়ে লাখো মানুষের জীবনকে পাপমগ্ন করার অপরাধ এক নয়। তদ্রূপ অর্থ সংশ্লিষ্ট অপরাধের ভয়াবহতাও অন্যান্য অপরাধের মত নয়। হাদীসের ভাষ্যমতে হারাম অর্থে লালিত দেহ জান্নাতে যাবে না। তেমনি যে ব্যক্তির পানাহার, পোশাক-আশাক বৈধ নয় তার কোন কাকুতি-মিনতিও আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না। সুতরাং সুদ বিষয়ক হারাম অপরাধকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অপরাধের সাথে তুলনা করে ছোট করে দেখার আদৌ অবকাশ নেই। মূলত ইসলামী ব্যাংকগুলো কর্তৃক ইসলামী ও শরীয়া শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণকে কাছে টানার এহেন প্রবণতাকে উলামায়ে কেরাম ঘোর আপত্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তাদের মতে, শরীয়া পরিপালনে যারা যতটুকু সফল তাদের শিরোনামে ততটুকুই উপস্থাপিত হওয়া উচিত; যাতে মানুষ প্রবঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের যাবতীয় গবেষণা ও কার্যক্রম কেবলই পরকালীন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা কেন্দ্রিক। আপামর জনসাধারণের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই তারা ইসলামী ব্যাংক সংক্রান্ত শরীয়াসম্মত পথ ও পন্থা আলোচনা করেন। ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে তাদের কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতা নেই; আবার প্রচলিত ধারার সাধারণ ব্যাংকগুলোর সাথেও তাদের দহরম-মহরম নেই। তাদের সকল চেষ্টা ও তৎপরতা নিছক আখেরাতমুখিতা ও উম্মাহর কল্যাণকামিতা থেকে উৎসারিত।

ইসলামী বীমা

বীমা একটি ফার্সী শব্দ; যার অর্থ দায়ভার, নিরাপত্তা। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায়

বীমা একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়। বড়সড় আর্থিক প্রজেক্টের বীমার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত বাধ্যবাধকতাও বিদ্যমান। এছাড়াও বীমা ব্যবস্থা একটি অর্থকরি পলিসিও বটে। ফলে অলিগলিতে বীমা প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। প্রচলিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৃশ্যমান সুদসহ অন্যান্য শরীয়া অসঙ্গতি বিদ্যমান। এ কারণে সুদের অবৈধতার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ মুসলিম জনসমাজকে বীমা পলিসিতে জড়িত করার নিমিত্ত বীমা শব্দের শুরুতে ইসলামী শিরোনাম যুক্ত করার প্রাদুর্ভাবও ঘটেছে বেশ আয়োজন করে। ভিতরে ইসলামী কিছু না রেখে কিংবা নামকেওয়াস্তে কিছু রেখে পোশাকী নামের এ সংযোজন ঘোরতর আপত্তিকর। শত্রুবিভীষণ কিংবা গৃহশত্রুর অনিষ্টতা বহিঃশত্রুর অনিষ্টতা থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কাজেই এ জাতীয় প্রবঞ্চনামূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজে বাঁচা ও উম্মাহকে বাঁচানো অপরিহার্য।

ইসলামিক টেলিভিশন

টেলিভিশন অর্থ দূরদর্শন। টেলিভিশন মানেই নাটক, ছায়াছবি, নৃত্যগান আর অশ্লীল বিজ্ঞাপনের সমারোহ। এগুলোই একটি টিভি চ্যানেলের মূল উপজীব্য। অধুনা টিভি চ্যানেলের নতুন একটি সংস্করণ হলো ইসলামিক টিভি। টিভিবিমুখ ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীকে টিভিমুখী করার চমৎকার প্রয়াস। টিভিতে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ চিত্রের পর্যায়ভুক্ত কি না এ নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে। আপাতত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি না। কিন্তু নারীমুখ দর্শনের নিষিদ্ধতা তো শক্তিময় প্রমাণসূত্রের ভিত্তিতেই প্রমাণিত। প্রচলিত ইসলামিক টিভিগুলো কি নারীমুখ প্রদর্শন থেকে পবিত্র? তাছাড়া টিভিবিমুখ মানুষ ইসলামিক টিভির কল্যাণে(?) টিভিমুখী হলে তাদের এ ঝোঁক কি শেষ অবধি ইসলামিক টিভির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে? সংবাদ কিংবা ইসলামিক প্রোগ্রামের নামে শেষ অবধি তারা নাচ-গান সম্বলিত প্রোগ্রামেও চোখ রাখবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এতে ইসলামী নামের কতটুকু সার্থকতা অর্জিত হবে? ইসলামী শিরোনামের দাবি তো ছিলো, টিভির আপাদমস্তক সওয়াব-পুণ্যির সমাহার থাকবে। ব্যাপারটি কি তাই হয়? তর্কের খাতিরে যদি এ শিরোনামের চ্যানেলগুলোকে বৈধ বলে অভিহিত করা হয় তবেও তো তাতে ইসলামী শিরোনামের সংযুক্তি শোভা পায় না। কোনো বিষয় শরীয়াগত দিক থেকে অনুমোদিত কিংবা আইনানুগ হলেই তাতে ইসলামী শিরোনামের সংযুক্তি করা যায় না। এমনটি যৌক্তিক হলে তো অনুমোদিত সকল কার্যক্রমে ইসলামী শিরোনাম শোভা পেতে থাকবে। ইসলামী দোকান, ইসলামী বিমান, ইসলামী বাস ও ইসলামী রিক্সার মত হাস্যকর আরো হাজারো রকমের অভিধা বেরিয়ে আসবে। কাজেই নিছক মুসলিম দর্শক টানার জন্য ইসলামী শিরোনাম সংযোজনের অনুমোদন কেউ দিবে না; না বিবেক, না শাস্ত্র।

ইসলামী নাটক

ইসলামী নাটক শব্দটিতেই কান্না-হাসির যুগপৎ উপাদান রয়েছে। নাটক আবার ইসলামী হয়? এক সময় ইসলামী মদের উপহাস শুনতাম। শব্দটি শুনে বড্ড হাসি পেত। বড় অদ্ভুত এ পৃথিবী। অদ্ভুত পৃথিবীর মানুষ। শব্দের ব্যবহারেও লালিত্য ও শিল্পবোধ, নৈতিকতা ও রুচিবোধ থাকতে হয়। শব্দের ব্যবহার যেন মানুষের হাস্যরসের উপাদেয় বস্তু না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সচেতন থাকতে হয়। নাটক মানে অভিনয়। নাটক মানে কৃত্রিমতা। আর প্রচলিত নাটক মানে অনৈতিকতার প্রস্রবণ। ইসলামী নাটকগুলো কি সে অনৈতিকতা বিদায় করতে পেরেছে? এগুলো কি অনৈতিকতা বিবর্জিত আপাদমস্তক নেকী-পুণ্যের বার্তাবাহক? অনুসন্ধিৎসু জবাব কিন্তু ইতিবাচক হবে না। সুতরাং ইসলামী শিরোনাম দেখেই এসব নাটক ফাটকে ঝাঁপ দেয়া যাবে না। এতে লাভ পুণ্যের কিছুই মিলবে না। উল্টো ইসলামী নাটকের নামে ইসলামী(?) গুনাহের ভাগী হওয়ার সুবিধা লাভ হবে।

ইসলামিক পার্টি/দল/ফ্রন্ট

ইসলামী বা ইসলামিক শিরোনামে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বহু দল উপদল রয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজ মুসলিম দেশে ইসলামী শিরোনাম যুক্ত করে রাজনীতি করতে হয়। অথচ একজন মুসলিমের সকল কর্মকাণ্ডই হওয়া কর্তব্য ইসলামী বিধানকেন্দ্রিক। নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে যেমন ইসলামী শিরোনাম যুক্ত করে বলতে হয় না আমি ইসলামী নামায পড়ছি তদ্রূপ রাজনীতি করার ক্ষেত্রেও ইসলামী রাজনীতি বলার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশে ইসলামী রাজনীতির প্রবক্তা অনেক রাজনৈতিক দল ইসলামী রাজনীতির বিধানাবলীর পরিপূর্ণ বা আংশিক অনুসরণ করে না। কাজেই ইসলামী শিরোনাম দেখেই কোনো রাজনৈতিক পার্টিতে অধিভুক্ত হওয়া যাবে না। এ দেশে অনেক ইসলামিক পার্টির পুরোধা আছেন যাদের দৈহিক অবকাঠামোতে ইসলামিক বিষয়ের ছিটে ফোঁটাও নেই। বিশ্বাসগত দিক থেকে ইসলাম চর্চার দিকে তাকলে মাথায় হাত পড়ে যাবে। অথচ সরল মনের মুসলিম মানুষগুলো ইসলামিক নামধামের টাইটেল শিরোনাম দেখে মজে যান। এভাবে নিছক নাম শিরোনাম দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা পার্টিকে পরিমাপ করা যায় না। আবার নাম শিরোনাম ইসলামী না হলেও ব্যক্তি ও দলের অনুশীলন কুরআন সুন্নাহকেন্দ্রিক হলেই চলবে। শিরোনাম বিযুক্তির কারণে তাতে কোনো রূপ ঘাটতি সৃষ্টি হবে না।

ইসলামী কার্টুন

হাসি কৌতুকের আরেক অধুনা মুদ্রণ ইসলামী কার্টুন। কার্টুন অর্থ ব্যঙ্গচিত্র, রঙ্গচিত্র, কৌতুকাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক চিত্র। ইসলামী বিধানে জীবচিত্রই তো নিষিদ্ধ। সেখানে জীবের ব্যঙ্গচিত্রের বিধান কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। নিন্দনীয় এমন একটি অবিধানিক বিষয়কে ইসলামীকরণের দুঃসাহস প্রদর্শন করা আমাদের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার। ইসলামের সুমহান ব্যক্তিদেরকে এসব কার্টুনে বিকৃতাকারে উপস্থাপন করা হয়। এসব কার্টুন মুভি নির্মাণ বস্তুত ইসলাম ও মুসলিম মনীষীদের অবমাননার নামান্তর। এগুলো যত সত্য কথাই বলা হোক, যত সত্য ইতিহাসই প্রচারিত হোক, তাতে কুরআন হাদীসের যত আলোচনাই থাকুক তাকে কোনোভাবেই ইসলামী অভিধায় ভূষিত করা যায় না। গোমূত্রে দুগ্ধ মিশ্রিত হলে মূত্রের মর্যাদা বেড়ে যায় না। সুতরাং কার্টুন যে বিষয়েরই হোক তা ইসলামী শরীয়া মতে নিষিদ্ধ। কার্টুনের শুরুতে নিছক ইসলামী শিরোনামের সংযোজন কার্টুনকে বিধানিক ও ইসলামিক বানিয়ে দিবে না। ইসলামী শিরোনামের এসব কার্টুনকে বা এর নির্মাণ ও প্রদর্শনীকে বৈধ জ্ঞান করার কোনোই অবকাশ নেই।

ইসলামী উপন্যাস

উপন্যাস মানে জাল গল্প, কল্পিত ঘটনা, কল্পনার কালিতে সুড়সুড়িমূলক উপস্থাপনা। উপন্যাসে নারী ঘটিত বিষয় বা প্রেম ভালবাসার উপাদান না হলে উপন্যাসের আবেদন চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। এমনতরো উপন্যাসেরই ফাঁকফোকরে ইসলামিক কিছু ডায়ালগ ছেড়ে দিলেই তা ইসলামিক হয়ে যায় না। কাজেই

এভাবে উপন্যাসের সাথে ইসলামী লেবেল এঁটে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা কোনোভাবেই বিধিত নয়। ইসলামী শিরোনামের বেশ কিছু উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার সুযোগ হয়েছে। সেখানে নানা রকম আপত্তিকর বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। বাজারে এমন ইসলামী উপন্যাসও রয়েছে যার লেখক তাকে ইসলামী বলতে রাজি নন; কিন্তু সেটাকে ইসলামী উপন্যাস হিসেবেই বাজারজাত করা হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের বিশেষ কিছু ঘটনার বাঁকে বাঁকে অসত্য কিংবা কল্পকথার সংযোজন ঘটিয়ে তাতে নারীত্বের মোহনীয় উপস্থাপন করে একে উপন্যাসের রূপ দেয়া নৈতিক দিক থেকে চরম বিপর্যয়কর। মোটকথা ইসলামী উপন্যাস মানেই ইসলাম সমর্থিত নয়। এসব উপন্যাসের পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা চালানো বিধিসম্মত নয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মানে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে দীনের জ্ঞান বিতরণ করা হবে। তদ্রূপ ব্যক্তি জীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে দীনী ইলমের বিশুদ্ধ চর্চা হবে। কারণ ইলম শুধু জানার নাম নয়; ইসলাম বিষয়ে জানা ও তা ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়ন করার সমন্বিত নাম হলো ইলমে দীন বা ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান। কোথাও শুধু দীনী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে সেটাকে ইসলামী প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা যায় না। আমাদের দেশে সরকার পরিচালিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামের শিক্ষা রয়েছে কিন্তু ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইসলামের চর্চা নেই। এখানে শুধু ইসলামের শিক্ষা চর্চা হয়। সেই শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আর মুসলিমদের ইসলামিক স্টাডিজ বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে পার্থক্য তো ব্যক্তি জীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইসলামের চর্চা হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে। এ ব্যবধান যদি উঠিয়ে রাখা হয় তাহলে এ দু শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মাঝে কোনো ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না। সরকার পরিচালিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনৈসলামিক কার্যকলাপের অন্ত নেই। কিন্তু নাম হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এ নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করা সরকারের গুরুদায়িত্ব।

ইসলামী গণতন্ত্র

গণতন্ত্র মানে মানবতন্ত্র। গণতন্ত্র শ্রেণীগত বৈষম্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটি উত্তম মাধ্যম বটে। গণতন্ত্রের অনৈসলামিক দিকগুলো বেশ পরিস্কার। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে প্রভেদের দেয়াল বেশ উঁচু ও পুরু। দু'টিকে একাকার করা হলে গণতন্ত্র বা ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; ইসলামী বিধান মেনে রাজনীতি করতে গেলে গণতন্ত্রের প্রয়োজন হবে কেন? গণতন্ত্র নিয়ে এত টানাহেঁচড়া কেন? গণতন্ত্র কখনো ইসলামী হতে পারে না। তবে যারা কিছু গণতান্ত্রিক কিছু ইসলামিক থিউরিতে বিশ্বাসী তারা ইসলামী গণতন্ত্রের ধারক হতে পারেন। দুগ্ধ-মূত্রের এরূপ পুঁতিগন্ধময় সমন্বয়ে আমরা বিশ্বাসী নই। এসব অদ্ভুত ইসলামীকরণে কিছু সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্তির ভাগাড়ে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কিই বা অর্জন হয়? মানুষ পোড়ানো, নাজায়েয হরতাল ধর্মঘটের নামে অন্যায়ভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলাসহ কিছু গণ ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে তেমন কিছুর উপস্থিতি পাওয়া যায় না এ গণতন্ত্রের মাঝে। সুতরাং শুরুতে 'ইসলামী' সংযুক্ত করা হলেই গণতন্ত্র ইসলামী হয়ে যাবে না। ইসলামায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভ্রান্ত ও নিষিদ্ধ দিকগুলোকে বিদূরিত করা সম্ভব নয়। অতএব গণতান্ত্রিক ইসলামায়নের এ বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ ধারাকে পরিহার করা উচিত।

ইসলামী নাম

ইসলামী নামের অর্থ, শরীয়াগত দিক থেকে যে নাম রাখা সঙ্গত। যে নাম রাখা বিধানগত দিক থেকে সঙ্গত নয় তা অনৈসলামিক। নামের ইসলামিক-অনৈসলামিক এ সরল ব্যবধান সমাজে প্রচলিত নয়। সমাজের ধারণা হলো, নামটা আরবী ভাষার হলে ইসলামিক; অর্থ যাই হোক। আরবী ভাষার না হলে সেটা অনৈসলামিক; অর্থ যাই হোক। নাম প্রসঙ্গে সামাজিক এ ধারণা বিভ্রান্তিকর। বস্তুত নামের সাথে ইসলামিক অনৈসলামিক এ সংযোজনটাই অবাঞ্ছিত। ব্যক্তির ইসলামিক নাম হলে গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলারও ইসলামিক নাম হওয়া চাই। শব্দটি আরবী হলেই কি তা ইসলামী হয়ে যায়? আরবী ভাষা কি ইসলামী ভাষা? অন্যান্য ভাষা কি তবে অনৈসলামিক? অর্থ বিবেচনা না করে আরবী শব্দ যোগে নামকরণ করা আদৌ উচিত নয়। মাহীন, গোলাম নবী, আব্দুল মুত্তালিব, খালেক, রাযযাক এ জাতীয় অসংখ্য আরবী ভাষার নাম সমাজে প্রচলিত আছে। অথচ এসব নামে নাম করণ বিধানগত দিক থেকে চরম আপত্তিকর। কুরআন হাদীসে থাকলেই সেটা ইসলামী বা বরকতপূর্ণ নাম হয় না। শয়তান, ফিরাউন, আবূ জাহেল, আবূ লাহাব-এগুলো কুরআন-হাদীসের শব্দ। তাই বলে কি এগুলো ইসলামী নাম? হাদীসে সুন্দর নাম রাখার কথা এসেছে। কুরআন-হাদীসের নামের কথা বলা হয়নি। শুধু আরবী নাম হলেই তা ইসলামিক হবে; অনারবী হলে অনৈসলামিক নাম হবে, ইসলামী শরীয়তে এমন কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। কুরআনের ভাষ্যমতে ভাষাবৈচিত্রও মহান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত। উপরন্তু পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীদের নামই ছিল অনারবী। তবে কুরআন হাদীসের ভাষা হিসেবে সুন্দর অর্থবোধক আরবী নাম রাখা উত্তম। হাদীসের ভাষ্যমতে আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান জাতীয় নামগুলো আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। মুসলিম সন্তানদের এমন নাম রাখা চাই যাতে নামের মাঝেই মুসলিম পরিচয় ফুটে উঠে। এমন নাম রাখা সঙ্গত নয় যাতে ধর্মপরিচয় জিজ্ঞেস করে মুসলিম অমুসলিম নির্ণয় করতে হয়। আজকের সমাজে জাগতিক বিষয়ে নামী দামী অমুসলিম ব্যক্তিদের প্রতি অতিরিক্ত আদিখ্যেতা ও প্রেমবোধ থেকে তাদের নাম করণের হিড়িক দেখা যায়। প্রথমত এগুলোর অর্থের মাঝে সৌন্দর্য নেই; দ্বিতীয়ত এমন অনেক নাম রয়েছে যার অর্থ বের করা তো দূরের কথা সেটা কোন ভাষার শব্দ তাই খুঁজে বের করা দুষ্কর। তৃতীয়ত অমুসলিমদের সাথে অন্যায় কারণে ভালবাসার সম্বন্ধ সৃষ্টি করা এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা শরীয়াগত দিক থেকে চরম আপত্তিকর। হাদীসের ভাষ্যমতে যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায় বা ব্যক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তার শ্রেণীভুক্ত গণ্য হবে। অর্থাৎ পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রেও এতদুভয়ের সাদৃশ্য অটুট থাকবে। সুতরাং নাম রাখার ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণের মনোভাব থাকলে তা আদৌ বৈধতার পর্যায়ে পড়বে না।

ইসলামিক মুভি

প্রযুক্তির এ যুগে ইন্টারনেটে অসংখ্য ইসলামিক শিরোনামের মুভির সন্ধান

পাওয়া যায়। মুভি অর্থ সচল ছবি, চলচ্চিত্র। এ যাবত নবী জীবন নিয়ে অসংখ্য চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ইসলামী বিধান মতে চলচ্চিত্রই যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের নিয়ে তা নির্মাণ করা কতটা জঘন্য তা সহজেই অনুমেয়। এগুলোর প্রথম উদ্যোক্তা ইয়াহুদী খ্রিস্টান। তাদের ক্ষেত্রে এটা না হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এ জাতীয় মুভি নির্মাণ করা কি করে যৌক্তিক ও বিধানিক হতে পারে। তদুপরি তার সাথে ইসলামিক লেভেল এঁটে দেয়া যে কতটা নিন্দনীয় তা বলাই বাহুল্য। ইরানের চলচ্চিত্রগুলোকে আমাদের সমাজে ইসলামিক মুভি হিসেবে জ্ঞান করা হয়। অথচ ইরানের শিয়া সম্প্রদায় তো মুসলিমই নয়। তাদের তৈরি চলচ্চিত্র ইসলামী হওয়া তো অনেক দূরের বিষয়। বস্তুত মুভি বা চলচ্চিত্র কখনো ইসলামী হতে পারে না। যেমন মদ কখনো ইসলামী হয় না। সুতরাং নামের শুরুতে ইসলামী লেবেল দেখেই তাকে বৈধ জ্ঞান করার অবকাশ নেই।

ইসলামিক টেরোরিজম

অদ্ভুত একটি শব্দ ইসলামিক টেরোরিজম। টেরোরিজম মানে সন্ত্রাসবাদ। অন্যায়ভাবে ত্রাস সৃষ্টি করাই হলো সন্ত্রাসবাদ। অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে ত্রাস সৃষ্টি করা হলো জিহাদ। ইসলামের আপাদমস্তকই তো ন্যায়ের ধারক। ইসলাম আর অন্যায়ের সহাবস্থান হতে পারে না কখনো। ইসলাম আর সন্ত্রাসবাদ পরস্পর সংঘর্ষিক দুই মেরুর দু'টি শব্দ। সুতরাং ইসলামিক টেরোরিজম কৌতুকপ্রদ হাসি উদ্রেককারী একটি শব্দ। শব্দটি মূলত পশ্চিমা চক্রের জিহাদ বিষয়ে ব্যাঙ্গাত্মক পরিভাষা। ইসলামী জিহাদকে তারা কৌতুকাত্মক উপস্থাপনায় ব্যাক্ত করে থাকে। অথচ জিহাদ ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পবিত্র বিধান। পৃথিবীর সবুজ ভূমিতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করার অন্যতম উপায় হলো জিহাদের বাস্তবায়ন। দেহের ক্ষতিকর অংশকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ পৃথিবীর দেহ থেকে জিহাদের মাধ্যমে দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর সকল প্রয়াস অবদমিত ও অপসারিত করা আবশ্যক। পবিত্র এ জিহাদ দীনের শত্রুদের বড় আতঙ্কের বিষয়। কারণ তারা ইসলামের সোনালী ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করেছে। তারা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছে, পবিত্র জিহাদের বাস্তবায়ন হলে তাদের জন্য এ পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। তাদের হম্বিতম্বির সলিল সমাধি হবে। তাই তারা পবিত্র এ শব্দটিকে নানা উপায়ে বিতর্কিত করে চলেছে। মুসলিম জনসমাজকে জিহাদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। যাতে মুসলিম সমাজ কোনোভাবেই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ না হতে পারে এবং সহজেই তারা জিহাদের ব্যাপারে অনাগ্রহী ও অনীহ হয়ে মুনাফেক উপাধী ধারণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারে। আজকের পৃথিবীতে কোথাও অন্যায়ের প্রতিবাদে জিহাদের আওয়াজ উচ্চকিত হলে তাকে অন্যায় বলে দমিয়ে দিতে সকল কুফুরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। মোটকথা ইসলামী সন্ত্রাসবাদ নামে কোনো শব্দ পৃথিবীর অভিধানে নেই। এটা কুফরী শক্তির একটি শক্তিশালী কূটচাল। তারা কিছু দালাল তৈরি করে সন্ত্রাস ছড়ায় আর সেটাকে ইসলামী নাম দিয়ে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করে। অন্তত কোনো মুসলিম এ কূটচালে বিভ্রান্ত হতে পারে না। সুতরাং জিহাদ আর সন্ত্রাস কখনো এক নয়। সন্ত্রাসবাদ দমনের পবিত্র লক্ষ্যেই জিহাদের উত্থান ঘটেছে। পবিত্র জিহাদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে ইতিবাচক ও আগ্রহমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেই হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ইসলামী বিপ্লব

ইসলামী বিপ্লব মানে ইরানের খোমেনী বিপ্লব। আমাদের জন্য ইরানের শিয়া বিপ্লবের ব্যাপারে আগ্রহ উদ্দীপনা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। আমাদের সমাজে শিয়া সুন্নী ব্যবধানকে হানাফী শাফিয়ী ব্যবধানের মত সহজাত ব্যবধান ও সত্যের বৈচিত্র বলে জ্ঞান করা হয়। এ ধরনের মুক্তমনা ধারণা চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তি। শিয়া বিশেষত খোমেনীপন্থী শিয়া সম্প্রদায় নিছক শিয়া; মুসলিম নয়। তাদেরকে মুসলিম হিসেবে বিবেচেনা করা ঈমানের জন্য চরম ক্ষতিকর। যারা কুরআনকে অসম্পূর্ণ বলে, নবী পত্নী আয়েশা রাযি. কে জাহান্নামী, ব্যাভিচারিণী বলে আখ্যায়িত করে উপহাস করে, যে ব্যক্তি আবূ বকর, উমর রাযি. সহ অসংখ্য সাহাবীকে কাফের সাব্যস্ত করে তার 'মুসলিম' হিসেবে অভিহিত হওয়ার কী অধিকার আছে! ওদের সাথে উদারতা দেখালে নবী আত্মা কষ্ট পাবে। রোজ হাশরে শাফাআত-সুপারিশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ইসলামী বিপ্লব বলে ইরানী বিপ্লবকে মহিমান্বিত করা একজন মুসলিমের জন্য আদৌ বৈধ নয়। কারণ সেটা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিপ্লব। এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব জ্ঞান করা বিধিত নয়। ইসলামী বিপ্লব বলে এ বিপ্লবের প্রতি আগ্রাহান্বিত হওয়া কিংবা এ জাতীয় বিপ্লবকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়া মতে গর্হিত কাজ।

ইসলামিক ডিগ্রি

ইসলাম বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়া শোনার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশের কলেজ ভার্সিটিগুলোতেও স্বতন্ত্র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রয়েছে। এগুলো প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনা। তবে ভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগগুলোতে যা কিছুর পাঠ দান করা হয় তা বিশুদ্ধ ইসলামিক কি না তা নিয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। ভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস গ্রন্থগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে। তাতে সাহাবা কেন্দ্রিক আলোচনাগুলোতে বেশ আপত্তিকর অসঙ্গতি বিদ্যমান। এ জাতীয় ইতিহাস পাঠে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বিশেষত মুয়াবিয়া রাযি. এর ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হয়। সুলতান মাহমূদ গজনবীসহ মুসলিম শাসকদের নিয়েও রয়েছে আপত্তিকর উপস্থাপনা। শিয়া কিংবা ইয়াহুদী খ্রিস্টান রচিত ইসলামী ইতিহাসের অনুবাদ কিংবা তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ইতিহাস গ্রন্থই এসব অসঙ্গতির মূল সূত্র। এ কারণেই ভার্সিটি লেভেল থেকে ইসলামিক ডিগ্রি ধারী ডক্টরদের চিন্তা চেতনায় বেশ প্রান্তিকতা ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গিয়ে যদি ইসলাম বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করা হয় তাতে আপত্তি ততো জোরালো হয় না। কিন্তু যদি ইউরোপ আমেরিকা গিয়ে ইয়াহুদী খ্রিস্টান পরিচালিত ভার্সিটিগুলো থেকে ইসলামের উপর ডিগ্রি গ্রহণ করা হয় তাহলে তা চরম বিস্ময় সৃষ্টি করে। ইহুদী খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইসলামের জাত শত্রু। চর্মচোখে কালেভদ্রে মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের আদিখ্যেতা পরিলক্ষিত হলেও তার পেছনেও থাকে তাদের টার্গেট বাস্তবায়নের সুপ্ত কূটকৌশল। ইহুদী খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সম্পর্কের ধরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ইহুদী খ্রিস্টান সম্প্রদায় তোমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না যাবত না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করবে। (সূরা বাকারা- ১২০)

কাজেই এমতাবস্থায় তারা যখন অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খুলে তখন স্বভাবতই তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ জাতীয় নামসর্বস্ব ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগগুলো মুনাফেকদের তৈরি মসজিদে যিরারেরই অধুনা সংস্করণ। প্রাচ্যবাদও হাদীস অস্বীকৃতির দীক্ষা এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়। বিদগ্ধ গবেষক ড. মুসতাফা সিবায়ী রাহ. অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের এসব ইসলামিক বিভাগগুলোর গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন কলা কৌশলে তাদের মূল এজেন্ডাগুলো উদ্ধার করে এনেছেন। তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীয়িল ইসলামী'তে এসব বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষেণ উদ্ধৃত হয়েছে। তাই অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে ইসলামিক বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসা ডক্টর ও স্কলারদের বক্তব্য ও রচনাতে ফুটে ওঠে নতুন এক ইসলামের প্রতিচ্ছবি; যেখানে হাদীস আসারের কোনো বালাই নেই। হাদীস নামের সকল বর্ণনাই নাকি অপাংক্তেয়। খণ্ডিত চিন্তার ধারক হয়ে এই ডিগ্রিধারীরা সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ান। সুতরাং ডিগ্রিধারীদের নামের শুরুতে ইসলামিক দেখেই তাদের উপস্থাপিত ইসলামকে নিরেট ভাবা যাবে না।

দৈনিক পত্রিকার ইসলামী পাতা/ধর্মপাতা

প্রচলিত দৈনিকগুলোতে ইসলাম বিষয়ে একটি পাতা বরাদ্দ রাখা হয়। এটা বেশ ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক দিক। তবে সে বিভাগটিতে পাঠানো সব লেখাকেই বাছ বিচার ব্যতিরেকে ছেপে দেয়া হয়; যা চরম আপত্তিকর। লেখকের ইসলাম বিষয়ে বিশুদ্ধ একাডেমিক বিদ্যা আছে কি নেই কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারটিতে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা লালন করেন না। সমাজে ধর্মহীনতা ও ধর্মের নামে কূপমণ্ডুকতার বিষবাষ্প মূলত এভাবেই ছড়ায়। কেননা মুদ্রিত হরফে যা কিছুর সাক্ষাত হবে তাকেই বিশুদ্ধ ও আসল জ্ঞান করার মারাত্মক প্রবণতা সমাজে বিদ্যমান। মোকছুদুল মোমিনীন ও নেয়ামুল কোরআন জাতীয় অপাংক্তেয় বইগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। 'কোরআনের পর্দাকে বোরকায় ঢাকল কারা?', 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি', 'কবিদের এবাদাত অথবা প্রকৃতির সত্যপাঠ', 'কলমসৈনিক বরেণ্য আলেম মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন' -এ জাতীয় আপত্তিকর শিরোনামের অসংখ্য নিবন্ধ প্রবন্ধ দৈনিকগুলোর ইসলামী পাতায় স্থাপন পায়। এভাবে মূলত ইসলাম প্রচারের নামে ইসলামের ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে। এসব বিভ্রান্তিকর নিবন্ধ পাঠ করে মানুষ ইসলাম বিষয়ে ভুল বার্তা পাচ্ছে। সুতরাং সব ইসলামী পাতা বা ধর্মপাতা নিরেট ইসলামী বা বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

শেষকথা

ইসলামী উপাধিযুক্ত কিছু শিরোনামের আলোচনা উপরে প্রদত্ত হলো। আমাদের সমাজে এ জাতীয় অসংখ্য শিরোনামের সন্ধান মিলবে, যেখানে নামটাই শুধু বিদ্যমান; নামের আবেদনের কোনো বাস্তবায়ন নেই। কোথাও কদাচিৎ ইসলামের কিছু থাকলেও তা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিশেষত আর্থিক বিষয়াবলীতে এ শিরোনামের অবাধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আপন স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্তে মানুষকে কাছে টানার মাধ্যম হিসেবে ইসলামের নামকে ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে 'হালাল' শব্দটিরও একটি বাণিজ্যিক ব্যবহার বিদ্যমান। তাছাড়া মানুষ আরবী শব্দকেও ইসলামী শব্দের বিকল্প হিসেবে জ্ঞান করে থাকে। আরবী নাম শিরোনামকে সঠিক ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করে। আরবী বা ইসলামী পরিভাষাগুলোর ব্যবহার দেখেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আশঙ্কার কথা হলো, আপামর মুসলিম জনসাধারণের এ দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টানরা ইসলামী পরিভাষাগুলো ব্যবহার শুরু করেছে। ফলে তাদের ধর্মান্তর পলিসিতে গতিময়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলাফলও কাঙ্ক্ষিত। কাদিয়ানী ও শিয়ারাও একই পদ্ধতিতে মুসলিমদেরকে কাদিয়ানী ও শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করছে। সুতরাং ইসলামী শিরোনাম বা পরিভাষার এ ছদ্মাবরণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও সজাগ হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচকিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : আমীনুত তা'লীম;
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(১৬ পৃষ্ঠার পর; মুফতীদের জন্য...)

একথা সঠিক নয়। আমরা এর জবাব দেব, হিদায়া কিতাবের লেখকের উদ্দেশ্য ছিল শরীয়তের হুকুম-আহকামকে যৌক্তিক দলীলাদি দ্বারা প্রমাণ করা। হিদায়া আদালতের কিতাব– বিচারকার্যের কিতাব। আর আদালতে বা বিচারকার্যে সাধারণত কুরআন-হাদীস উপস্থাপন করা হয় না। সেখানে তো যৌক্তিক প্রমাণাদী উপস্থাপন করা হয়। তাই হিদায়া কিতাবের লেখক কুরআন-হাদীস উল্লেখ করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। তিনি হিদায়া কিতাবটি বেশি বেশি যৌক্তিক প্রমাণাদী উপস্থাপন এবং অন্যদের যৌক্তিক প্রমাণের খণ্ডন দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। এটাই তার ইচ্ছা ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, হানাফীরা হাদীস জানে না। মিশকাতুল মাসাবীহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাত এর লেখক মোল্লা আলী কারী রহ. কি হানাফী নন? তার লিখিত কিতাব শরহেবেকায়া তো হিদায়ার মুতাবাদিল। তিনি শরহেবেকায়ার মধ্যে কুরআন-হাদীসের দলীলাদী বর্ণনা করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছেন। সেখানে প্রতিটি মাসআলায় চার/পাঁচটি করে হাদীস পাওয়া যায়। এছাড়াও বর্তমানে আরো কিতাব পাওয়া যায় আল-ফিকহুল হানাফী ওয়াআদিল্লাতুহু। হানাফী মাযহাবের যত মাসআলা রয়েছে তার বহু দলীল সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা, বর্তমান সময়টা উন্নতি করার এবং বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করার জন্য সবচে সহজ সময়। যখন বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন হবে এবং মানুষ ইলমের দিক বিচারে দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান হবে তখন এ সমস্ত লোকের মোকাবেলা সহজ হবে। এদের ইলমের দৌড় বেশি দূর নয়। এরা সামান্য কিছু হাদীস মুখস্থ করে নিয়েছে; সেই সাথে কিছু গালি-গালাজও। তারা সর্বত্র মানুষকে প্রতারিত করার ধান্ধায় থাকে। এগুলো মোকাবেলা করার যিম্মাদারী হকপন্থী উলামায়ে কেরামের। উলামায়ে কেরাম তাদের কথা শুনবেন, মজবুত জবাব দিবেন, পাশাপাশি উম্মতকেও প্রশান্ত করবেন। এজন্যই দারুল ইফতার তালিবুল ইলমকে বেশি বেশি কিতাব মুতালাআ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ : মাওলানা মাহমুদুল হাসান
শিক্ষক, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

আপনার হজ্জ কবুল হোক!

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

[খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত রহ. এর ‘হজ্জে মাবরূর’ শিরোনামাধীন বয়ান অবলম্বনে]

আসছে যিলহজ্জ। আসছে মাওলা প্রেমীদের হজ্জ। বাইতুল্লাহর ছায়ায় সম্মিলন ঘটবে লক্ষ লক্ষ আশেকের। লাব্বাইক লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হবে কাবা প্রাঙ্গণ। ‘তোমার সকাশে হাযির হে প্রভু!’ এই চেতনা বুকে ধারণ করে সুদূর বাংলা থেকেও অসংখ্য মানুষ রওয়ানা হবেন মক্কা-মদীনার পানে।

পাঠক! পবিত্র এই কাফেলায় শামিল হওয়ার স্বপ্ন তো প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে চির জাগরুক থাকে। সে স্বপ্ন পূরণে আমরা অনেকেই হয়তো যাচ্ছি কাবার পানে, মদীনার টানে। কিন্তু রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাযিরী দেয়ার জন্য যে পুঁজি আমাদের সাথে থাকা দরকার তা কি আমরা সংগ্রহ করেছি?

মুহতারাম পাঠক! আমি সফরের আর্থিক পুঁজির কথা বলছি না। সেতো স্বাভাবিকভাবে সব মুসাফিরই সংগ্রহ করেন। বরং এই পুঁজি অর্জনের পরই সাধারণত সবাই সফরের নিয়ত করেন। তবে যেই সম্বল নিতে আমরা অনেকেই ভুলে যাই সেটা হল রূহানী সম্বল; যেটা ছাড়া আমাদের হজ্জ সফর প্রাণহীন নিছক একটা ভ্রমণ হিসেবেই থেকে যায়। সেসব রূহানী সম্বলের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বক্ষমান এই আলোচনা।

নিয়তের পরিশুদ্ধি

পরিশুদ্ধ নিয়তের অপর নাম ইখলাস। মুমিনের প্রত্যেকটা আমলেই ইখলাস থাকতে হবে। কিন্তু হজ্জের মধ্যে ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা অন্য সব আমল থেকে বেশি। কারণ আমাদের জীবনে যেসব আমল বারবার করতে হয় সেগুলোতে যদি প্রথমবার ইখলাসের অপূর্ণতা থাকে বা ইখলাস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে, তবুও পরবর্তীতে সে আমল করার সময় নতুনভাবে নিয়তকে খালেস করার চেষ্টা করা সম্ভব। অপরদিকে যে আমল জীবনে ফরয হয় মাত্র একবার সেটাতে যদি ইখলাসের অভাব থাকে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব হয় না।

নামাযের কথাই ধরুন; দিনে পাঁচবার এটা ফরয হয়। যদি নামাযের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম কোন ব্যক্তির ইখলাস অর্জিত নাও হয় তবু চেষ্টা করলে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পর তার নামাযে ইখলাস এসে যাবে। রোযা এবং যাকাত যদিও অতটা ঘন ঘন আসে না, তবু প্রতি বছর একবার তো তার মওকা অবশ্যই আসে; প্রথমবার ইখলাস না থাকলেও পরবর্তীতে চেষ্টা করে ইখলাস অর্জন সম্ভব হয়।

এই দিক থেকে হজ্জ সম্পূর্ণ বিপরীত। নফল হজ্জ যে যত বেশিই করুক না কেন উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে হজ্জ জীবনে শুধু একবারই ফরয হয়। সুতরাং প্রথমবারের ফরয হজ্জে যদি কারো ইখলাসের ত্রুটি থাকে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আর কিছুতেই সম্ভব নয়। দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে ইখলাসের কথা কত গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

অর্থ : বলুন, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদত করতে। (সূরা যুমার- ১১)

এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে। শুধু তাই নয়; এ ব্যাপারে তাঁর আদিষ্ট হওয়ার কথা উম্মতকেও জানাতে বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ তা‘আলার একান্ত প্রিয়ভাজন। তাঁকেই যখন এত তাগিদের সাথে ইখলাসের আদেশ করা হয়েছে সেখানে আমাদের জন্য হুকুম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ইখলাসের আভিধানিক অর্থ খালেস করা, বিমুক্ত করা, পরিশুদ্ধ করা। খালেস ঘি ঐ ঘিকেই বলা হয় যার মধ্যে অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকে না। ইবাদতের মধ্যে ইখলাসের অর্থও এটাই; অর্থাৎ ইবাদত থেকে ইবাদত-বহির্ভূত সবকিছুকে আলাদা করে ফেলা। নামায আদায়ের মাধ্যমে বুযুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ হওয়ার আশা করা, যাকাত দিয়ে খ্যাতির আশায় থাকা– এগুলো হল ইবাদত-বহির্ভূত বিষয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে নিজের মাকসাদ বানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

সুতরাং আমাদের হজ্জকে ইখলাসপূর্ণ করতে হলে সেটাকেও ইখলাস পরিপন্থী সব বিষয়ের মিশ্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। লোকে হাজী বলবে এ নিয়তে হজ্জ করা যাবে না। হজ্জ না করলে লোক কী বলবে! এটা ভেবেও হজ্জ করা যাবে না। আবার কোন রকম নিয়ত ছাড়া নিছক রেওয়ায পালনার্থেও হজ্জ করা যাবে না। বরং হজ্জ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

অর্থ : মানুষের মধ্যে যে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭)

সম্পদ যেন হয় হালাল

নিয়ত সহীহ করার পর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সম্পদের দিকে। অনেকেই এদিকে কোন গুরুত্ব দেন না। সুদ, ঘুষ বা অন্য যে কোন রকম হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে হজ্জে যান। অথচ হাদীসে স্পষ্ট আছে, অনেক উস্কখুস্ক চুল বিশিষ্ট মানুষ দীর্ঘ সফর শেষে দুই হাত তুলে দু‘আ করে; এদিকে তার খাদ্য-বস্ত্র সবই হারাম অর্থে উপার্জিত। তাহলে কিভাবে তার দু‘আ কবুল হবে?

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, হারাম উপর্জন সাথে থাকলে দু‘আ কবুল হয় না। যেহেতু দু‘আ একটি ইবাদত তাই এ থেকে অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও বোঝা যায়; অর্থাৎ হারাম মাল সাথে থাকলে কোন ইবাদতই কবুল হবে না। সুতরাং হজ্জের সফরের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সব খরচই যেন হালাল উপার্জন থেকে হয়, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে।

রাব্বুল আলামীনের অতিথি আমরা

আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে তাওফীক দিয়েছেন; আপনি হজ্জের সফরে বের হয়েছেন। যদি ঘর থেকে বের হয়েই আপনি সুবিধা অর্জনের লড়াই শুরু করে দেন তাহলে কি সেটা একজন কাবার পথের যাত্রীর জন্য শোভনীয় হবে? অথচ এমনটাই দেখা যায়। সফরের শুরু থেকেই বেশির ভাগ মানুষ সুবিধা অর্জনের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন। বাসে উঠার সময় হুড়াহুড়ি, বাস থেকে নামার সময় তাড়াতাড়ি, এমনকি বিমানে উঠার সময়ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এই আল্লাহর বান্দাদের কে বোঝাবে যে, বিমানে প্রত্যেকের জন্য আসন বরাদ্দ করা আছে? আপনি সবার শেষে উঠলেও দেখবেন, আপনার জন্য বরাদ্দকৃত আসন খালিই পড়ে আছে।

সেখানে পৌঁছার পর দেখা যায় আরেক দৃশ্য। ভিন্ন ট্রাভেলসের মাধ্যমে আগত বাংলাদেশী কোন হাজী সাহেবের সাথে পরিচয় হলেই প্রথম প্রশ্ন হয়, আপনি কত টাকা দিয়ে এসেছেন? যদি উত্তরে বলা টাকার পরিমাণ প্রশ্নকারীর খরচ হওয়া টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে পরের প্রশ্ন আসে, আপনার বাসা হারাম থেকে কতদূরে? বাসার কোয়ালিটি কেমন? খাবারের মান কেমন ইত্যাদি। এসব তুলনামূলক আলোচনার পর শুরু হয় খেদোক্তি আর আফসোস। টাকা বেশি খরচ হওয়ার হতাশা আর দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো সারাক্ষণই তাকে অস্থির ও বিরক্ত করে রাখে। ফলে ট্রাভেলস এজেন্সির দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করা নিত্য দিনের রুটিন হয়ে যায়। অথচ বাস্তবতা হল, কোন ট্রাভেলস এজেন্সিই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়। এমনকি অনেক সময় তো এমনও হয় যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট নয় এবং সেটা সামাল দেয়ার সাধ্য তাদের নিজেদেরও থাকে না। আর যদি মেনেই নিই যে, কোন এজেন্সি ইচ্ছা করেই হাজীদের বিপাকে ফেলেন তাহলে প্রশ্ন হল, এই ধরনের এজেন্সির দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করে কোন হাজী সাহেব তাদেরকে পুরোপুরি শুধরে ফেলেছেন– এমন নযীর কি কেউ দেখাতে পারবেন? মনে তো হয় না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় সুন্দরভাবে দায়িত্বশীলদেরকে নিজেদের সমস্যার কথা বুঝিয়ে বললেও হয়তো কিছুটা ফায়দা পাওয়া যাবে। এরপরও কাজ না হলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারানো যাবে না। মনে রাখতে হবে, আমরা হলাম রাব্বুল আলামীনের মেহমান। আমাদের প্রত্যেকটা আচরণ-উচ্চারণ তাঁর শান অনুযায়ীই হওয়া উচিত।

দেশে ফেরার পর

দেশে ফেরার পর অনেককেই দেখা যায় নিজের হজ্জের কথা সবাইকে জানানোর জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এটা করতে মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কেউ কেউ মক্কা-মদীনার দর্শনীয় স্থানের গপ্পো করতে থাকেন। অন্য কোন হাজী সাহেবের সাথে দেখা হলেই বলেন, আরে আপনি জাবালে নূরেই যাননি, তাহলে আপনি আর কী হজ্জ করেছেন! ওয়াদিয়ে জিন-এ না গেলে তো আপনার সফরই বৃথা!

কেউ কেউ এতটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও কোন না কোনভাবে উপস্থিত মানুষকে বুঝিয়ে দেন যে, আমি হজ্জ করেছি।

জনৈক বুযুর্গ এক লোকের মেহমান হয়েছিলেন। সে ব্যক্তি তার খাদেমকে বলল, আমার দ্বিতীয় হজ্জ থেকে আনা পাত্র দিয়ে হযরতকে পানি পান করাও। বুযুর্গ বললেন, আপনি তো এক কথার মাধ্যমেই দুই হজ্জকে শেষ করে দিলেন!

আবার কেউ কেউ একটু ভিন্নভাবে নিজের হজ্জের কথা প্রকাশ করেন। হজ্জ থেকে ফিরেই তারা সফরের কষ্ট-ক্লেশের বর্ণনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এতে একদিকে যেমন তার নিজের সওয়াবে ঘাটতি হতে থাকে অন্যদিকে শ্রোতাদের মধ্যেও হজ্জের সফরের ব্যাপারে ভীতি জন্মাতে থাকে। কিছু মানুষ তো অবশ্যই এমন পাওয়া যাবে যারা শুধু সফরের কষ্টের কথা শুনে শুনে নিজেদের ফরয হজ্জকে বিলম্বিত করছেন। সুতরাং হজ্জের কষ্টের বর্ণনা করা আর কাউকে হজ্জ করতে বাধা দেয়া একই কথা। তবে যদি কোন বিজ্ঞ লোক ইন্তিজামের সুবিধার্থে সেখানের সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর কথা আগেভাগেই বলে যেন, সেটার কথা ভিন্ন।

আমার হজ্জ কবুল হয়েছে তো?

একজন হাজী হজ্জের সমস্ত শর্ত পালন করলেও তাকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচলে দুলতে হয়। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না যে, তার হজ্জ অবশ্যই কবুল হয়েছে। তবে কিছু আলামত এমন রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে হজ্জ কবুল হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশা করা যায়।

হজ্জের পর যদি কেউ পুরোপুরিভাবে দীন পালনের চেষ্টা শুরু করে দেন, আশা করা যায় তার হজ্জ কবুল হয়েছে। হজ্জের পর কারো লেনদেন, আদব-আখলাক, ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে উন্নতি দেখা যাওয়াটাও হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত। হজ্জের পর যদি নিজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়, তাহলেও আমরা কবুলিয়াতের আশা করতে পারি। হজ্জ কবুল হওয়ার বড় একটি আলামত হল, আবার সেখানে যাওয়ার পিপাসা অন্তরে সৃষ্টি হওয়া। যদি হজ্জ থেকে ফিরে কারো এ কথা মনে হয় বা মুখেই বলে ফেলে, না বাবা, একবারই যথেষ্ট; আর যাওয়া যাবে না। তাহলে অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তার হজ্জ কবুল হয়নি। এজন্য সব সময় দু'আ এবং চেষ্টা করতে হবে যেন বারবার আল্লাহর ঘরে হাযিরী দেয়ার ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয়। আসলে সত্যিকারার্থে যিনি খোদাপ্রেমিক হন, তার হৃদয়ে তো সব সময় জ্বলজ্বল করে কাবার ছবি। শয়নে-স্বপনে তিনি ভাবেন মসজিদে নববীর কথা। সুদূর বাংলাদেশে থেকেও তার মন পড়ে থাকে হারামের প্রাঙ্গণে। একবার হজ্জ করে কিছুতেই মন ভরে না তার। তাই সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যান বারবার।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে 'হজ্জে মাবরূর' নসীব করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(৩১ পৃষ্ঠার পর; সুখি পরিবার...)

তার কান্নায় এলাকার আকাশ-বাতাসও যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। এখন আর এ মহিলার খোঁজ-খবর এ বাড়ির কারো জানা নেই।

ডাক্তার সাহেবের কাছে প্রতারিত লোকের তালিকা এমনিতেই অনেক দীর্ঘ। সর্বশেষ এ অবলা নারী ও নিরপরাধ শিশুরাও। সম্ভবত এদের কারো ফরিয়াদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন।

এক কুরবানীর ঈদের দিনে ঈদগাহ থেকে ফেরার পর গরুর গোশত বানানোর সময় ডাক্তার সাহেব পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সে থেকে দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখনো শয্যাশায়ী। দিন দিন অবনতি। আরো যে কতদিন এভাবে কাটবে কেউ বলতে পারে না। জানা শোনা যে-ই তার অবস্থা দেখে সকলেই মনে মনে বলে, 'পাপ তার বাপরেও ছাড়ে না'।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তাকে তার সকল পাপ মোচন করে যাওয়ার সুযোগ ও চৈতন্য দান করেন। আমীন।

লেখক : আবু তামীম

মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা ইদরীস সন্দ্বীপী রহ.

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা সীমাহীন ত্যাগ, অনুপম সাধনা ও জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে ইলমে ইলাহী ও ইলমে নববীর ময়দানকে আবাদ রেখেছেন, যারা ইসলাহে বাতিনের বিস্তৃত ময়দানে রাহবার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খচিত, মরেও যারা অমর হয়ে আছেন মানুষের হৃদয়পটে, যাদের নাম শুনলে মানুষের হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরে যায়, যারা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান আলোকবর্তিকা, সেসব মহাপুরুষের মত হলেন হযরত ইদরীস সন্দ্বীপী রহ.।

তিনি ছিলেন কর্মদক্ষ ও কর্মতৎপর এক মহান পুরুষ। তিনি ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ তিতিক্ষা ও অবিরাম প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রকৃত নায়েবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপে গড়ে তুলেছেন। তার কাথা-বার্তা, চাল-চলন ও জীপনযাপন দেখলে আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কথা মনে পড়ত। তার মাঝে সিদ্দীকী উদারতা, ফারূকী সাহসিকতা, উসমানী লাজুকতা ও হায়দারী বিচক্ষণতার ভাব চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। তিনি নববী ও সাহাবী জীবনাদর্শকে জীবনের সম্বল করে নিয়েছিলেন। ফলে তার নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখে মানুষ বিমুগ্ধ হতো। তিনি আরাম, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া, সবকিছু ত্যাগ করে দীনের খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দীনের খিদমতে তিনি ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম সুন্নাত মোতাবেক হোক, প্রতিটি মানুষের জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শ ফুটে উঠুক। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইলমের খিদমতে মশগুল ছিলেন; যার ফলে দেশ-বিদেশে তার প্রতিষ্ঠিত শতাধিক মাদরাসায় আজো গুঞ্জরিত হচ্ছে ইলমে ওহীর দীপ্তবাণী।

জন্ম : প্রকৃতির কোলে কালের সূর্যোদয়

এই মহান মনীষী খ্রিস্টাব্দ ১৯৩১ সনে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলাধীন সন্দ্বীপ থানার এক নিবিড় পল্লী সন্তোষপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ আব্দুল গনী এবং মাতার নাম সায়্যিদাতুন নিসা।

সন্দ্বীপ নামটি শুনলে আমাদের কল্পনায় প্রকৃতির যে অপরূপ নৈসর্গিক চিত্র ভেসে ওঠে তেমন মায়াময় পরিবেশেই শৈশবের সোনাঝরা দিনগুলো অতিক্রম করেন তিনি। মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন বলে বাল্যকাল থেকেই তার চিন্তা-চেতনা এক অসম ব্যাপ্তি লাভ করে। পিতা-মাতার স্নেহছায়ায় থেকে সত্য ও সততা, ন্যায় ও ইনসাফের কঠিন পাঠগুলো সহজেই আত্মস্থ করে নেন। শিশুকাল থেকেই তার মনে সুপ্ত ছিল ইলমে ইলাহীর তীব্র পিপাসা।

শিক্ষা : সফলতার হাতছানি

হযরত রহ. এর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় সন্দ্বীপের মুন্সিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এর পাশাপাশি তিনি তার বাল্য উস্তাদ মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের কাছে কায়েদা থেকে কুরআনুল কারীম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও এ সময় তিনি মিফতাহুল জান্নাত, রুকনুদ্দীন, কারীমা, পান্দেনামা, গুলিস্তাঁ, সিকান্দারনামা ইত্যাদি কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন। শৈশবের শেখা উপদেশমূলক কিতাব কারীমা ও গুলিস্তাঁর প্রভাব হযরতের সমগ্র জীবন ধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। সমসাময়িক আলেমগণের মতে হযরতের জীবন ছিল কারীমা ও গুলিস্তাঁর প্রতিচ্ছবি। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাইটভাঙ্গায় অবস্থিত করিমবাড়ী মাদরাসায়। সেখানে নাহু-সরফের অভিজ্ঞ উস্তাদ মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ সাহেবের কাছে শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে বশিরিয়া সিনিয়র ইসলামিয়া মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তর শেষ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা করেন। প্রতিটি ক্লাসেই তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। সেখানে পড়াশোনা করা অবস্থায়ই তার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ইন্তিকাল করেন। মেধা ও মনোযোগ, আমল-আখলাক ও সুন্নাতী লেবাসের কারণে উস্তাদগণ তাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং আদর করতেন। তাই উস্তাদগণ তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেওবন্দ যাওয়ার পরামর্শ দেন। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও অবশেষে তিনি পাড়ি জমান বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে তিনি দীর্ঘ চার বছর উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

খিলাফত প্রাপ্তি : সূর্যের আলো থেকেই পূর্ণিমা

দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস সমাপনান্তে আওলাদে রাসূল সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. তাকে বললেন, যাও; দেশে গিয়ে দীনের খিদমত করো, চাই তা কায়েদায়ে বোগদাদী পড়ানোর মাধ্যমেই হোক না কেন। তিনি বললেন, হযরত! আপনার হাতে বাইয়াত হতে চাই। মাদানী রহ. তাকে বাইয়াত করে নিলেন। শুরু হল সুলূকের পথে কঠিন মেহনত। শাইখের সঙ্গে গড়ে উঠল হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক। শাইখকে না দেখলে তিনি অস্থির-অশান্ত হয়ে পড়তেন। শাইখকে দেখলেই তার চোখ জুড়িয়ে যেত, সব দুঃখ ভুলে যেতেন।

আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর সংস্পর্শে থেকে তিনি টানা দেড় বছর সুলূক ও আধ্যাত্মিকতার পথে মেহনত করেন। দুই বছর পর মাদানী রহ. এর খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ ছয় বছর পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই চার বছরের শিক্ষার্জন ও দু'বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে তিনি একবারও দেশে আসেননি। দেশে ফেরার পর তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সমাজ থেকে বিদআত ও কুসংস্কার দূরীকরণে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

শিক্ষকতা : আলো ছড়ায় সবার তরে

হযরত মাওলানা ইদরীস সাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সন্দ্বীপ আসার পর প্রথমে সন্দ্বীপ কাঠগড় ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই

তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের আমল-আখলাকের প্রতি গুরুত্ব দিতে থাকেন। কিছুদিন পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসে, 'হযরত! এমন পীড়াপীড়ি করলে তো সব ছাত্র চলে যাবে; মাদরাসা চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।' হযরত বললেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার সময় তো শর্ত দিয়েছিলাম যে, এসব বিষয়ের প্রতি আমি গুরুত্ব দেব। আপনাদের যখন অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আমি ইস্তফা নিচ্ছি। এরপর তিনি সেখান থেকে বাড়িতে চলে আসেন এবং কিছু ছাত্রকে নিয়ে বাড়িতেই দরস-তাদরীস চালু করেন। কিছুদিন পর দারুল উলূম দক্ষিণ সন্দ্বীপের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান করা হলে তিনি সেটাকে কওমী মাদরাসা করার শর্তে রাজি হন। এরপর তিন বছর সে দায়িত্ব পালন করেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : ইদরীসী কাননের প্রথম বৃক্ষ

দারুল উলূম দক্ষিণ সন্দ্বীপে শিক্ষক থাকা অবস্থায় হযরত মাওলানা ইদরীস সাহেব রহ. নিজ গ্রাম সন্তোষপুরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ইলহাম প্রাপ্ত হন। তাই সেখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজ গ্রামে কিছু জমি ক্রয় করেন এবং সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই হল হযরত রহ. এর প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদরাসা।

এই মাদরাসার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত রহ. এর প্রথম যুগের ছাত্র মাওলানা আব্দুল গনী সাহেব বলেন, শুরুতে অতি কষ্টে চলতো মাদরাসাটি। আখের পাতা দিয়ে ঘরের বেড়া দেয়া হয়েছিল। হযরত একাই প্রায় সাড়ে তিনশত ছাত্রের শরহেজামী পর্যন্ত ক্লাস নিতেন। পাশাপাশি মাদরাসার আনুষঙ্গিক কাজও আঞ্জাম দিতেন। পরবর্তীতে অবশ্য মাওলানা খুরশিদ নামে একজন উস্তাদকে খিদমতে নিযুক্ত করেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর এলাকার বিদআতপন্থীরা হযরতের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হতে থাকে। বারবার মাদরাসার উপর আক্রমণ আসতে থাকে। সেই প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে হযরতের প্রথম যুগের ছাত্র মাওলানা আতীকুল্লাহ সাহেব (বর্তমান সন্তোষপুর মাদরাসার মুহতামিম) বলেন, এলাকার প্রভাবশালী মাইজভাণ্ডারীরা এই দীনী প্রতিষ্ঠানকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়ার জন্য বারবার মিটিং করতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গায়েবী সাহায্য এবং নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের সাহসী উদ্যোগে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হযরত রহ. কে শারীরিক ও মানসিক বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। বিভিন্ন ঝড়-ঝাপটায় বারবার এই মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপরও তিনি তার সাধনা থেকে ক্ষান্ত হননি। অর্থের অভাবে একদিকে নিজে মজুর সেজে কাজ করতেন, অন্যদিকে ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমাজ থেকে বিদ'আতের শিকড় উৎখাতে নিয়োজিত থাকতেন। নিজ হাতে মাদরাসায় নারিকেল গাছ রোপন করতেন। ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাদরাসার পুকুর খনন করতেন। মাদরাসার প্রতিটি ইট-পাথরে, প্রতিটি বালুকণায় তার শ্রমের সুবাস মিশে আছে।

মাদরাসার উন্নতিকল্পে দিনভর মানুষের মাঝে মেহনত, রাতভর মহান আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করা তার নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

মাদানীনগর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

প্রায় ত্রিশ বছর সন্দ্বীপে দীনী তা'লীম ও তরবিয়াত প্রদানের মাধ্যমে হাজারো আলেম তৈরি করার পর তখন আল্লাহ তা'আলা হযরতের অন্তরে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে দীনী তা'লীম প্রদানের প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। ফলে তিনি প্রথমে নরসিংদী জেলার ইসলামপুরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সাত বছর পর্যন্ত প্রতি রমাযানে হযরত সেখানেই ই'তিকাফ করতেন। ইসলামপুর মাদরাসা যখন মোটামুটি জমে যায় তখন তিনি দীনদার শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় বর্তমান মাদানীনগর মাদরাসা এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর বহু কাঙ্ক্ষিত দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয় ৭ই শাওয়াল ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর বড় সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আস'আদ মাদানী রহ.। মাত্র ষোল জন ছাত্র নিয়ে শুরু হওয়া জামি'আর পথযাত্রায় আজ সেখানে শিক্ষার্জন করছে দুই হাজারেরও বেশি তালিবে ইলম।

বাইতুল্লাহর সফর

হযরত রহ. সন্দ্বীপের সন্তোষপুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে পাকিস্তান গমন করেন। এরপর রায়বেন্ড তাবলীগী মারকায থেকে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. সহ শীর্ষ মুরুব্বীদের সাথে ছয় মাস তাবলীগে সময় কাটান। প্রথম চার মাস পাকিস্তানে এবং পরবর্তী দুই মাস হজ্জে সৌদি আরবে থাকেন। এই জামাআতে হযরতকে 'মুআল্লিমুল হুজ্জাজ' এর দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কাকরাইলের হযরত মাওলানা লুতফুর রহমান রহ. ও শীর্ষ মুরুব্বীদের জামাআতের সাথে দ্বিতীয়বার হজ্জব্রত আদায় করেন। তিনি প্রায় ১২ বার হজ্জ ও উমরা পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ভিনদেশে দীনী সফর

হযরত রহ. ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন ও আমেরিকা সফর করেন। প্রথমে লন্ডনে গমন করে সেখানে মসজিদ ও ইসলামী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। লন্ডনে অবস্থানরত মুসলমানগণ হযরতকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আরো বেশি বেশি লন্ডন সফরের আমন্ত্রণ জানান। লন্ডন সফর শেষে হযরত আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং নিউইয়র্কে একটি মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেখানেও বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামী সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় আরববিশ্ব, আমেরিকা ও কানাডা সফর করেন। তার পূর্বে তিনি সৌদি আরব ও আরব আমিরাত গমন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন

হযরত রহ. এর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও দীপ্তিময়। তার সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেটেছে মূলত তিনটি কাজে। তা'লীম-তরবিয়াত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধিকরণ। তা'লীম ও তরবিয়াতের ময়দানে তিনি তৈরি করেছেন একদল যোগ্য ও নিষ্ঠাবান আলেম। প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের আনাচে কানাচে শতাধিক মাদরাসা। হযরতের ইচ্ছা ছিল দেশের প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। সেই মাকসাদকে সামনে নিয়ে তিনি গঠন করেছেন তা'লীমী বোর্ড 'মাদারিসে কওমিয়া আরাবিয়া বাংলাদেশ'; যার কার্যক্রম এখনো স্বমহিমায় বিদ্যমান।

তার তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধিকরণের এই নীতির ফলে হাজার হাজার পথহারা মানুষ পেয়েছে আপন প্রতিপালকের সঠিক পরিচয়। এই ধারা অব্যাহত রাখতে গঠিত হয়েছে 'তাহরীকে ইসলাহুল উম্মাহ'; যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাসিক ইসলাহী জোড়সহ মাদানীনগর মাদরাসা ময়দানে বার্ষিক

ইসলাহী জোড়ের আয়োজন করা হয়। এছাড়া জনসাধারণের দীনী উন্নতি সাধনে দাওয়াত ও তাবলীগী মেহনতের সমতুল্য কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্য তিনি নিজে যেমন এই কাজে সময় ব্যয় করেছেন তেমনি তার অধীনে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে এই কাজের তাগিদ দিয়েছেন। এসব কারণে তিনি সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছেন।

ইন্তিকাল : অস্তাচলে কালের সূর্য

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গহীন পল্লী সন্দ্বীপের সন্তোষপুর থেকে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি উদিত হয়েছিল, গত ২০শে রমাযান ১৪২৩ হিজরী মোতাবেক ২৬শে নভেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ন'টায় চিরকালের জন্য তা নিভে যায়। এক স্ত্রী, চার কন্যা, সাত পুত্র, প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অসংখ্য ছাত্র, মুরীদান, মুহিব্বীন ও মুতাআল্লিকীনকে এতীম করে পাড়ি জমান তিনি অসীম জান্নাতের পথে। সেই থেকে ইথারে ইথারে তার মধুর কণ্ঠস্বর আর ধ্বনিত হয় না। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। শুধু আছে তার রেখে যাওয়া সমুজ্জ্বল কীর্তিগুলো। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন। তার মর্তবাকে বুলন্দ করে দিন এবং তার মাকাম আরো উঁচু করে দিন।

আপন উদ্যানে সমাহিত

দুপুর গড়িয়ে বিকেল; অবশেষে রাত হয়ে এলো। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার উলামা-তৃলাবা, দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাওহীদী জনতার ঢল নামল মাদানীনগর অভিমুখে। মাদরাসার ভবনসমূহ, সুবিশাল মসজিদ, জামি'আ প্রাঙ্গন, পথ-ঘাট সব লোকে লোকারণ্য হলো। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। যে যেখানে জায়গা পেয়েছে দাঁড়িয়ে গেছে। জানাযার আগে সবকিছু নিস্তব্ধ হল। মাদানীনগরের মাটি ও মানুষ, পাখপাখালি, গাছগাছালী সবই যেন নীরব ভাষায় কাঁদতে লাগল। সকলেই শোকে মুহ্যমান। চোখে পানি, মুখমণ্ডলে হতাশা আর নিরাশার কালো ছায়া। এক পর্যায়ে সবাই শেষ শ্রদ্ধাটুকু নিবেদন করতে নামাযে জানাযায় দাঁড়ালো। জানাযার ইমামতি করেন হযরত রহ. এর বড় সাহেবযাদা হযরত মাওলানা হাফেয ফয়জুল্লাহ সাহেব দা.বা.। এক আবেগপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে শেষ হলো হযরতের নামাযে জানাযা।

নামাযে জানাযায় শরীক ছিলেন বাইতুল মুকাররমের তৎকালীন খতীব মাওলানা উবাইদুল হক রহ.। প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে চিরনিদ্রায় শায়িত দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। হযরত রহ. এর নিকটাত্মীয় ও পরিবারবর্গের পরামর্শে হযরতের পবিত্র দেহ মসজিদের কোল ঘেষে জামি'আর সবুজ প্রাঙ্গনে দাফন করার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে হাজারো জনতার স্রোত ডিঙ্গিয়ে অবশেষে হযরত রহ. কে কবর প্রাঙ্গনে আনা হয়। মাদরাসা মাঠের পশ্চিম পাশে মসজিদের কোল ঘেষে বেড়ে ওঠা মনোরম সবুজ উদ্যানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় ক্ষণজন্মা এই মহামনীষীকে। উপরে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, প্রকৃতির ঝিরঝির বাতাস, প্রস্ফুটিত হাসনাহেনার সুরভিত সৌরভ আর জান্নাতী আবহ। এরই মাঝে প্রশান্তচিত্তে চির নিদ্রায় শায়িত মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা ইদরীস সন্দ্বীপী রহ.। যেখানে জোনাকিরা আলো জ্বেলে সঙ্গ দেবে রাতের আঁধারে, গাছেরা ছায়া দেবে প্রখর সূর্যতাপে। ভোর বেলায় শিশুদের সুললিত তিলাওয়াত আত্মাকে করবে বিমোহিত আর সকাল-সন্ধ্যা মুআযযিনের আযানের সুমধুর ধ্বনি। তিনি রূহানী চোখে দেখবেন, যে চেতনা তিনি আমৃত্যু মনে লালন করেছেন, তার সূতীকাগারেই তিনি শায়িত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তার লালিত স্বপ্ন, কল্পিত কল্পনাগুলো আমাদেরকে বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংকলন : শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

মক্কার আকাশে উদিত হয় নবুওয়াতী ধারার সর্বশেষ রবি

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নবুওয়াত রবির উদয়

পৃথিবীর বুকে প্রথম ইবাদত গৃহ বাইতুল্লাহর কারণে সমগ্র আরবে পবিত্র মক্কা নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত এবং সে গৃহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকায় সমগ্র আরবে কুরাইশ ও বনূ হাশিমের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় নিয়েই আরবের কুরাইশ গোত্রের বনূ হাশিমের খান্দানে আগমন করেন শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম..., মক্কার আকাশে উদিত হয় আখেরী নবীর নবুওয়াতের সর্বশেষ রবি...!

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কোনো দ্বিমত নেই যে, যে বছর ইয়ামানের বাদশা আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংস করতে এসে নিজেই সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে বছরই রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, তা রবিউল আউয়াল মাসের কততম তারিখ ছিল? ২ তারিখ, ৮ তারিখ, ৯ তারিখ, ১০ তারিখ, ১২ তারিখ প্রভৃতি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে নবীজীর জন্ম তারিখ ছিল ৯ রবিউল আউয়াল। মিসরের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ পাশাও দীর্ঘ গবেষণার পর এ মতটিকেই প্রমাণ করেছেন। (দেখুন, তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৭৫, ইবনে কাসীর কৃত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৮২, হিফযুর রহমান সিওহারবী কৃত 'কাসাসুল কুরআন ৪/৪৬৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার ইন্তিকাল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে শামে গমন করেন। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি মদীনায় মামাদের নিকট বনী আদি ইবনে নাজ্জারের বসতিতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ১/৪৬), তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৮৭)

জন্মকালীন মু'জিযাপূর্ণ ঘটনা

সাহাবী হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, মাতা আমেনা যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রসব করেন, তখন তিনি একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মী দেখতে পান, যে আলোয় সুদূর 'শামে'র প্রাসাদসমূহ তার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭১৫১)

সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবীজীর মাতা আমেনা বলেন, 'আমি তাকে (নবীজীকে) গর্ভধারণ করা থেকে নিয়ে প্রসব করা পর্যন্ত কোনো কষ্ট অনুভব করিনি। যখন সে ভূমিষ্ঠ হলো, তার সাথে একটি নূর বের হলো, যে নূরে পূর্ব হতে পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেলো...! এরপর সে যমীনের উপর দু'হাতে ভর দিয়ে একমুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলো...!' (তবাকাতে ইবনে সা'আদ ১/৪৭, তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৮৬)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামকরণ

হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারী (৭/১৯৫; হা.নং ৩৮৫১) গ্রন্থে ইমাম বাইহাকী রহ. এর দালাইলুন নবুওয়াহ গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে একটি বর্ণনা এনেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পর আব্দুল মুত্তালিব দাওয়াতের আয়োজন করেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ', যেন যমীনে সৃষ্টিকুল এবং আসমানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসা করেন...!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাগণ

সীরাতের ইমাম ইবনে হিশাম রহ. এর মতে নবীজীর চাচাদের সংখ্যা নয়জন-

১. সাইয়িদুশ শুহাদা হামযা রাযি., ২. আব্বাস রাযি., ৩. আবূ তালিব (আবদে মানাফ), ৪. আবূ লাহাব (আব্দুল উয্যা), ৫. হারেস, ৬. যুবাইর, ৭. হাযাল, ৮. যিরার, ৯. মুকাওয়িম। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৪৪) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৬৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফুগণ

নবীজীর ফুফু ছিলেন ছয়জন-

১. আরওয়া, ২. উমাইমা, ৩. বার্‌রাহ, ৪. সফিয়্যাহ রাযি., ৫. আতিকা, ৬. উম্মে হাকীম আল-বাইযা। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩০৫), আল ওফী বিল ওফায়াত ১/৮০)

দুগ্ধপান, শৈশব ও বাল্যকাল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম তার সম্মানিতা মাতা দুধ পান করান। এরপর আবূ লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' দুধ পান করান। সুওয়াইবার পর এ সৌভাগ্য বিবি হালিমা সা'দিয়া লাভ করেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের পর সুওয়াইবা তার মুনীব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ লাহাবকে ভাতিজার জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রদান করেন। আবূ লাহাব এ সুসংবাদ শোনামাত্রই সুওয়াইবাকে আযাদ করে দেয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৯৫)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, 'আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর তার বংশের কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার কী অবস্থা? আবূ লাহাব বললো, 'তোমাদের (থেকে বিদায়ের) পর আমি কোনো শান্তি দেখতে পাইনি। তবে সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে আমাকে 'বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলের মধ্যমূলের ছিদ্র দিয়ে (পানি) পান করানো হয়েছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক; হা.নং ১৩৯৫৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১০১)

হালিমা সা'দিয়া রাযি. এর সা'আদাত

ইমাম যাহাবী রহ. তার তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে (১/৩৮৬) নির্ভরযোগ্য সনদে হালিমা সা'দিয়া রাযি.[১] এর দুগ্ধপান করানোর ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। আরবের অভিজাত সংস্কৃতি, বিশুদ্ধ ভাষা এবং নির্মল আবহাওয়ায় সুন্দর শারীরিক বৃদ্ধির নিমিত্তে দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধপান করানোর জন্য পাঠিয়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ধাত্রীগণ শহরে এসে বাচ্চা সংগ্রহ করে দুধ পান

---

১. হালিমা সা'দিয়ার পিতার নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস, যার উপনাম 'আবূ যুওয়াইব'। তবে বিবি হালিমা রাযি. কে তার দাদার দিকে সম্পৃক্ত করে 'হালিমা বিনতে হারিসও বলা হয়। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আল-ইসাবা লি ইবনে হাজার ৮/৮৭)

করানোর জন্য নিজ নিজ গ্রামে নিয়ে যেতেন। হালিমা সা'দিয়াও সে রীতি অনুযায়ী মক্কায় আগমন করেন। এতীম মুহাম্মাদকে কেউ যখন উপঢৌকন স্বল্পতার শঙ্কায় নিলো না, তখন হালিমা এ সা'আদাত লাভ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে অনেক বরকত তিনি লাভ করেন। যথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ফেরার সময় তার দুর্বল সওয়ারী গাধী কাফেলার সকলের অগ্রগামী হয়ে যায়। সঙ্গে থাকা বৃদ্ধ উটনী- যা দুর্ভিক্ষের দরুণ এক ফোটা দুধ দিতো না– তার ওলান দুধে ভরে যায়। দুর্ভিক্ষের শিকার নিজ গ্রামে পৌঁছলে গ্রামের অন্যান্যদের বকরীগুলো দুধশূন্য থাকলেও তার বকরীগুলোর ওলান দিন শেষে ঠিকই দুধপূর্ণ হয়ে যেতো...!

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় (হা.নং ৫১০১) এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বছর হালিমা সা'দিয়ার কাছে প্রতিপালিত হন।

বক্ষ বিদারণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদারণের ঘটনা কয়বার সংঘটিত হয়েছে? এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে বক্ষ বিদারণের ঘটনা চারবার সংঘটিত হয়েছে। ১. শৈশবে বিবি হালিমা রাযি. এর কাছে ২. দশ বছর বয়সে ৩. নবুওয়াতের পূর্বে ৪. মি'রাজের পূর্বে। (শরহুয্ যুরকানী আলাল-মাওয়াহিব ১/২৮৮)

তবে হাফেয যাহাবী রহ. (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৮৭) এবং হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৯৯) 'বক্ষ বিদারণ' দু'বার হওয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একবার শৈশবে হালিমা রাযি. এর কাছে থাকাবস্থায়। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে। সহীহ মুসলিমের (হা.নং ৪২৫, ৪২৭) দু'টি বর্ণনায় দু'বারের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমবার বক্ষ বিদারণের সময় জিবরাঈল আ. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা ফেড়ে কলব বের করে শয়তানী অংশ ফেলে দিয়ে যমযমের পানি দ্বারা অন্তর ধুয়ে দেন। দ্বিতীয়বার ইলম ও হিকমত দ্বারা অন্তরকে পূর্ণ করে দেন। (সুলাইমান নদভী কৃত সীরাতুন্নবী ৩/২৬৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা ও দাদার ইন্তিকাল এবং চাচার অধীনে প্রতিপালন

মদীনায় বনূ আদী ইবনে নাজ্জারের বসতি থেকে পিতার মামাদের সাথে দেখা করে মায়ের সাথে ফেরার সময়– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ৬ বছর– তখন 'আবওয়া' নামক স্থানে মাতা আমেনা ইন্তেকাল করেন। সঙ্গে থাকা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসী উম্মে আইমান রাযি.[২] তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন আট বছর, তখন স্নেহশীল দাদাও ইহকাল ত্যাগ করেন। দাদার মৃত্যুপূর্ব ওসিয়ত মোতাবেক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবূ তালিবের অধীনে প্রতিপালিত হতে থাকেন। চাচা আবূ তালিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। সবসময় নিজের কাছে কাছে রাখতেন এবং নিজ সন্তানদের তুলনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি মায়া করতেন। (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী; পৃষ্ঠা ৩৮৮, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; পৃষ্ঠা ৩০৫)

নবুওয়াতপূর্ব যিন্দেগী
নবীজীর বকরী চরানো

আম্বিয়া আ. এর সুন্নাত হলো, তাঁরা তাদের জীবিকার ভার অন্য কারো উপর ন্যস্ত করেন না; বরং নিজেরাই নিজেদের কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবীজীও এ সুন্নাত আদায় করেছেন। নবুওয়াতের পূর্বে চাচা আবূ তালিবের নিকট থাকা অবস্থায় নবীজী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বকরী চরিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবসার সাথেও জড়িত হয়েছিলেন। প্রত্যেক নবী দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত প্রদানের পূর্বে বকরী চরানোর কাজ করিয়েছেন। বকরী চরানোর হিকমত প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন, 'মূলত বকরী চরানোর বিষয়টি ছিলো উম্মতের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণস্বরূপ। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বকরী অধিক বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল হওয়ায় তা নিয়ন্ত্রণ করা, হিংস্র নেকড়ে ইত্যাদি থেকে হেফাযত করা বেশি কষ্টকর। বকরীর প্রতি সীমাহীন দরদ এবং সার্বক্ষণিক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাড়া তা সম্ভব নয়। নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বিচ্যুত পথের অনুসারী মানব কাফেলাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যও প্রয়োজন এমন দরদ ও বিচক্ষণ 'রাহবারীর'।

এ কারণেই আম্বিয়া আ. থেকে এ কষ্টকর কাজ করানো হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় সাইয়িদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বালক বয়সে চাচার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন বকরী চরানোর কাজ করেছেন এবং নিজের জীবিকার ভার নিজেই বহন করেছেন! মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বোজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়! (দেখুন : সহীহ বুখারী; ২২৬২, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩১৮, কাসাসুল কুরআন [হিফযুর রহমান সিওহারবী] ৪/৪৭০)

চাচার সাথে বাণিজ্যিক সফর এবং নবুওয়াতের সুসংবাদ

চাচা আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন একবার নবীজী চাচার ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে শামের (বর্তমান জর্ডানের) উদ্দেশ্যে সফর করেন। এ সময় নবীজীর বয়স ছিলো বারো বছর। 'বুসরা' নামক এলাকায় পৌঁছলে 'বাহীরা' নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাদের দেখা হয়। গাছ ও পাথর-টিলা কর্তৃক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করতে দেখে, মেঘ কর্তৃক ছায়া করতে দেখে, পিঠের মহরে নবুওয়াত দেখে পাদ্রী আখেরী নবীকে চিনে ফেললো এবং প্রকাশ্যে এ ঘোষণা প্রদান করলো যে,

هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
هَذَا يبعثه اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থ : এই ব্যক্তি 'সাইয়িদুল আলামীন', তিনি রাব্বুল আলামীনের পয়গম্বর, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' হিসেবে প্রেরণ করবেন।

এরপর উক্ত পাদ্রী কাফেলার জন্য খানার আয়োজন করত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে রোমে যেতে নিষেধ করে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার জন্য আবূ তালিবকে অনুরোধ করল। আবূ তালিব কোনো এক ব্যক্তির সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন...! (মুসনাদে বাযযার; হা.নং ৩০৯৬, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৬২০)

উল্লেখ্য,'মতন' (মূলপাঠ)- এর দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাটির শুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসীনদের কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। তবে হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ ঘটনাটির 'সনদ' (বর্ণনাসূত্র) কে 'শক্তিশালী' আখ্যায়িত করে মূল ঘটনাটি সঠিক হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২১৭, আল ইসাবা ১/৪৭৫, যাদুল মা'আদ ১/৭৬, তারীখুল ইসলাম ১/৩৯১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩০৮, সীরাতে মুস্তফা, ইদ্রিস কান্ধলভী রহ. কৃত ১/৮৯, মুফতী তকী উসমানী দা.বা. কৃত 'সফর দর সফর' এর 'জর্ডান সফর')

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

[২] পিতা থেকে মীরাসসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আযাদ করে দিয়ে হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযি. এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি

اشرف السوانح

আশরাফ চরিত

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

কালের গতিধারায় বহু যুগ পরপর যে সকল মহামনীষী মাটির পৃথিবীতে আগমন করে পথহারা মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের সঠিক পথনির্দেশ করেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার বান্দাদেরকে জুড়ে দেন, সেই পুণ্যাত্মাদের অন্যতম হচ্ছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.। তিনি এ যুগের হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামে তরীকত, শাইখুল মাশাইখ, কুতবুল ইরশাদ ও ওলীয়ে কামেল। উপমহাদেশের আলেম সমাজ ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি সর্বজনমান্য ও সকল শ্রেণীর মানুষের অনুসরণীয়।

হযরতের অন্যতম খলীফা শাহ আবরারুল হক রহ. বলেন, 'হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ব্যক্তিত্ব কারও পরিচিতির মুখাপেক্ষী নয়। তিনি দীনের হিফাযত ও প্রচার, ইসলামী উলূম ও মাআরিফের পুনর্জীবন ও উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সম্ভবত দীনের এমন কোন শাখা নেই, যে সম্পর্কে তার সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও হিদায়াতের জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমানে নেই।'

হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেন, ' সূর্য নিজেই তার পরিচয়, আলাদা পরিচয়ে তার প্রয়োজন নেই, তেমনি হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এরও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি ছিলেন জামিউল মুহাদ্দিসীন ও যুগশ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কারক।'

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেন, 'বর্তমান কালে উপমহাদেশের সকল আলেম-ফাযেল ও পুণ্যাত্মা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ফয়েয ও বরকতধারায় সিক্ত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের বুকে ধর্মীয় ভাবধারার উপর এ দেশেরই কৃতিসন্তান যে কয়েকজন দুর্লভ ব্যক্তির অসামান্য প্রভাব রয়েছে– যেমন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ., মাওলানা আতহার আলী রহ., মাওলানা আব্দুল আযীয বটতলী রহ., মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব হাটহাজারী রহ., মাওলানা নূরবখস রহ., মাওলানা মাকসূদুল্লাহ রহ. ও হাফেজ্জী হুজুর রহ.– তারা সকলেই হযরত থানবী রহ. এর ফয়েয, সোহবত ও খেলাফতপ্রাপ্ত।'

আমীরুল উমারা আল্লামা মাহমুদুল হাসান দা.বা. বলেন, 'হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার রূহানী খেদমত ও সংস্কারমূলক অবদানের জন্য তাকে 'হাকীমুল উম্মত' ও 'মুজাদ্দিদে মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল।'

এই মহামনীষীর অমর জীবনী গ্রন্থের নাম– আশরাফুস সাওয়ানেহ (আশরাফ চরিত)।

জীবনীকার হলেন হযরত খাজা আযীযুল হাসান গৌরী রহ.। তিনি ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং তদানীন্তন অখণ্ড ভারতের ডেপুটি কালেক্টর। ভারতের এক বিখ্যাত দীনী পরিবারে জন্মপ্রাপ্ত এই ব্যক্তি যৌবনকাল থেকেই হযরত থানবী রহ. এর সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি হযরতের আশেক এবং বিশেষ খলীফাদের মধ্যেও বিশিষ্ট ছিলেন। হযরত থানবী রহ.এর কাছে প্রভু প্রেমের সুধা পান করে তিনি থানবী রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন উচ্চ মানের কবি ও আরেফীনের মরমী কাব্যের গুণগ্রাহী পাঠক। হযরতের ভাবধারার সঙ্গে তিনি ছিলেন নিবিড়ভাবে পরিচিত। এ সকল কারণে থানবী দরবারের যোগ্য আলেমগণও হযরতের জীবন-চরিত রচনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন খাজা সাহেবেরই উপর। বলা বাহুল্য, এই সুধী ব্যক্তির হাতে সকলের পুণ্য আশা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। রচিত হয়েছে অমরগ্রন্থ আশরাফুস সাওয়ানেহ (আশরাফ চরিত)।

বিষয়-বিন্যাস

উর্দূ ভাষায় রচিত চার খণ্ডের এই মূল্যবান গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে রয়েছে হযরতের প্রাথমিক জীবনের শিক্ষণীয় বিবরণ, তার কামালাত অর্জন ও ক্রমবিকাশের ঘটনাবলী, যেগুলো সকল মুসলমানের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে তার অর্জিত ফয়েয ও বারাকাত বিতরণের কথা, ইসলাহী ও তা'লীমী মূলনীতিসমূহ, তার তা'লীম তরবিয়াতের পদ্ধতি এবং তার মামুলাত, সমাজ সংস্কার, রচনাবলী, গুণাবলী ইত্যাদির বিবরণ।

চতুর্থ খণ্ডটি লেখা হয়েছিল হযরতের ওফাতের পর। একজন প্রকৃত ওলীআল্লাহ কীভাবে ইন্তিকাল করেন, এই শেষ খণ্ডে রয়েছে তার চমকপ্রদ বিবরণ। বইখানি পাঠ করে পাঠক স্বতঃই বলে উঠবেন– এমন মৃত্যু আমারও নসীব হোক!

বৈশিষ্ট্যাবলী

অমরগ্রন্থ 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' (আশরাফ চরিত) পাক-ভারতসহ বাংলাদেশের উলামা ও তরীকতপন্থীদের নিকট সুপরিচিত। কারণ এ গ্রন্থখানি গতানুগতিক ভাবধারায় লিখিত জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং আদর্শ-জীবনের এক বাস্তব উপাখ্যান। গ্রন্থখানির প্রথম তিন খণ্ড হযরত থানবী রহ. এর জীবদ্দশায় রচিত হয়েছে বলে তার মধ্যে কোন প্রক্ষেপণ বা কল্পকাহিনী প্রবেশের সুযোগ পায়নি। আর এ গ্রন্থে কেবল হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর জীবনীই নয়; এতে আছে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ইতিহাস। আছে সেকালের মুসলমানদের অবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুন– এক কথায় উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। চার খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ জীবনী গ্রন্থটির প্রতি খণ্ডে হযরতের জীবনের এক এক অধ্যায়ের কথা বিবৃত হয়েছে। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, শিক্ষা, শিক্ষকতা, বিভিন্ন পরিবেশের পরিচিতি এবং কর্মবহুল জীবনের বহুমুখী সাধনা কবিতার মত কোমল পেলব মনোরম মায়াময় আবেশের সৃষ্টি করে। পড়তে পড়তে পাঠক হারিয়ে যায় সেকালের জনজীবনে, যেখানে রয়েছে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং রয়েছে গভীর সমুদ্রের গভীর তলদেশের পরম প্রশান্তি।

(০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... **অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)**

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৬

দশ বছর যাবত প্যারালাইজড হয়ে তিনি শয্যাশায়ী। পরিবারের সদস্যরাও তার বোঝা টানতে টানতে এখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এভাবে আর কত দিন? এ প্রশ্ন সকলের; কিন্তু জবাব কারো জানা নেই। জীবনের শুরুটা ছিল খুবই সম্ভাবনাময়। মাঝে এসে বৈচিত্রময় আর শেষে এমন দুঃসময়!

মেট্রিক পাশ করে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সহকারী পদে যোগদান করেন। কিছুদিন পর অফিস টাইমে একটি জেনারেল হাসপাতালে ডিউটি করার চাকরিও মিলে যায়। মেধা ছিল ভালো; যার ফলে হাসপাতাল ও চেম্বারে তার যথেষ্ট সুনাম। লোকজন তাকে ডাক্তার হিসেবে ডাকতে শুরু করলে তিনি নিজেও ভাবতে লাগলেন, এখন ইচ্ছা করলে ডাক্তারী করতে পারি। যেমন ভাবা তেমন কাজ– শুধু হাসপাতাল ঠিক রেখে চেম্বার ও কম্পাউন্ডারী ছেড়ে দিলেন। আর নিজ গ্রামে ছোট্ট একটি ফার্মেসী খুলে ডাক্তারী শুরু করলেন।

পানিতে কয়েক ধরনের ট্যাবলেট মিশিয়ে রোগীদেরকে সেবন করিয়ে দেন– এতে কোন না কোন ট্যাবলেটে রোগীদের অসুখও ভালো হতে শুরু করে। এছাড়া ইনজেকশন পুশ করা, স্যালাইন লাগানো, প্রেসার মাপা ইত্যাদি কাজগুলোও আঞ্জাম দিতে থাকেন নিরলসভাবে। আর জটিল কোন রোগী এলে নিজের সাথে করে জেনারেল হাসপাতালে বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনেন। ত্রিমুখী সেবার কারণে তার সুনাম ও সেবার পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এলাকার মানুষের বিপদের বন্ধু। সন্ধ্যারাত, মধ্যরাত ও শেষরাত যখনই ডাক পড়ে তৎক্ষণাৎ রোগীর বাড়িতে চলে যেতে তার কোন দ্বিধা নেই। মানুষ তার চিকিৎসায় যতটা উপকার পায় তার চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করে তার প্রতি আস্থা ও আন্তরিকতার কারণে। ডাক্তারী, ঔষধ বিক্রি ও হাসপাতালের চাকরি সব মিলিয়ে এখন আয়-রোযগার বেশ ভালো।

মেট্রিক পরীক্ষার পূর্বে লজিংয়ে থেকে পড়াশোনা করতেন আর লজিং বাড়ির ছেলে-মেয়েদের হোমওয়ার্কের মাস্টারীও করতেন। তাদের মধ্যে কচি মনের শিশুদের পাশাপাশি সেয়ানা ছেলে-মেয়েরাও ছিল। ওদের থেকে একজনকে তিনি ছাত্রীর মর্যাদা থেকে পদোন্নতি দিয়ে জীবন সঙ্গিনীরূপে গড়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। লজিং মাস্টারকে জামাই বানানো গ্রাম-গঞ্জের একটা সাধারণ প্রথা। সুতরাং তার এ স্বপ্ন বৃথা যায়নি। কর্মজীবনের শুরুতেই দু'পক্ষের সম্মতিতে তাদের শুভ পরিণয় এবং যথারীতি সংসার জীবন। সংসারে একে একে তিন মেয়ে দুই ছেলে মোট পাঁচ সন্তান। তার আয়-রোযগারে সংসার ভালোই চলছে।

এদিকে ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে। মাদরাসা ও স্কুলে যাওয়া-আসা করছে। সন্তানদের পাশাপাশি ছোট ভাই-বোনদের অভিভাবকও তিনি। ছোট অবয়ব; কিন্তু বড় অন্তরের মানুষ তিনি। বাজার-সদায় ও ক্ষয়-খরচায় জমিদারী ভাবসাব। চিতল মাছ, বোয়াল মাছ বাজারের বড়টার খদ্দের তিনিই। বোয়ালের দৈর্ঘ্য তার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। ভোজন বিলাস আর ভোগ বিলাস সহসাই তার সামর্থ্যসীমা অতিক্রম করবে বলে তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন। কাজেই আরো সহজ পন্থা এবং আরো বেশি আয়ের পন্থা হিসেবে আদম ব্যবসার কথা মাথায় উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। 'সুখে থাকলে ভুতে কিলায়', 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' এ জাতীয় প্রবাদ একসময় তিনিই অন্যদের শোনাতেন। কিন্তু তার নিজের জীবনেই যে বাস্তবায়িত হতে চলেছে এ ধরনের প্রবাদ সেদিকে খেয়াল করার ফুরসতটুকুও তার নেই।

শুরু হল আদম কালেকশন। পূর্ব পরিচিতি ও আস্থাই হল মূল পুঁজি। দু-চারজনকে বিদেশ পাঠায় তো নতুন করে আরো কয়েক ডজনের বায়না। আর সম্ভাব্য লাভের অংশ আগে-ভাগেই খরচ করে ফেলা– এ হল ব্যবসার ধরন। গোটা পরিবার যেন টাকায় ভাসছে। গ্রামের অন্যরা দেখে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেউ কেউ জমি-জমা বিক্রি করে তার হাতে তুলে দেয় তাদের ছেলে/নাতীকে যেন দয়া করে একটা ফ্রি ভিসায় মালয়েশিয়া যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি যে সকল এজেন্সীর দালালী করতেন তারা তাকে প্রলোভন দিয়ে দিয়ে যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছে তারপর থেকে শুরু হয়েছে ভাটার টান। লক্ষ লক্ষ টাকা এজেন্সীর হাতে তুলে দেয়ার পর এখন শুধু দুঃসংবাদ আর দুঃসংবাদ– কিছু লোকের ভিসা হয়নি, কিছু লোকের এন.ও.সি ভূয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এদিকে এলাকার লোকদেরকে ডান-বাম বলে আর কতদিন ভুল বোঝানো যায়! ভিসা বঞ্চিত ও প্রতারিত লোকদের দু-চার জন প্রতিদিন তার বাড়িতে হানা দিতে শুরু করেছে। তারা টাকা ফেরত চায়– কান্নাকাটি করে। কেউ কেউ হুমকি ধমকিও দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি রাতের আঁধারে এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কোন এক রাত শেষে কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তখন মোবাইল ফোনের যুগ ছিল না। লোক মারফতেই খোঁজাখুঁজি, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, ঢাকা, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ কোথাও তার খবর নেই। এদিকে বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই-বোন আর নাবালেগ সন্তানাদি। এদেরকে গালাগালি করে মনের ঝাল মিটানোই ছিল পাওনাদারদের শেষ প্রাপ্তি।

পরিবারকে সম্বলহীন করে স্বামীর এভাবে লোকান্তরে চলে যাওয়ায় পাঁচ সন্তানের মা অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে।

এরই মাঝে একদিন ডাক মারফত তার লেখা চিঠি এলো– 'মাগুরা জেলার এক

পাওনাদার তাকে ঢাকা থেকে মাগুরায় নিয়ে চোরের মত হাত-পা বেঁধে রেখেছে। সে দু-লাখ টাকা পাবে। যদি তার টাকা না দেয়া হয় তাহলে তাকে মেরে নদীতে ফেলে দিবে।' এ সংবাদ পেয়ে পরিবারের লোকেরা কান্না জুড়ে দিল। বৃদ্ধ বাবা তার অন্য সন্তানদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল– ধার-কর্য করে পাওনাদারের টাকা পরিশোধ করে তাকে ছাড়িয়ে আনবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ছোট ভাইকে পাঠিয়ে মাগুরার পাওনাদারের টাকা পরিশোধ করে তাকে বাড়িতে আনা হল।

তার বাড়ি আসার খবর এলাকায় জানাজানি হয়ে যেতেই শুরু হয়ে গেল স্থানীয় পাওনাদারদের হুমকি-ধমকি ও চাপ প্রয়োগ; যার মাত্রা আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। চাপ সামলাতে না পেরে এবারো সে রাতের আঁধারে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। যদিও তার এ পলায়নে পরিবারের কারোর হাত ছিল না; কিন্তু প্রাপকদের সকলের দাবী; পরিবারের লোকেরাই তাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে। কাজেই এবার পরিবারের উপর বিশেষ করে তার বাবা ও ভাইদের উপর তারা চড়াও হতে লাগল।

ঠিক এ সময়ে তার বৃদ্ধ বাবা পেনশন বাবদ প্রায় বিশ লাখ টাকা হাতে পেয়েছেন। তিনি তিতাসে চাকরি করতেন। বাবার পেনশনের টাকার খবর পেয়ে লোকেরা তার বাড়িতে এসে এমনভাবে হানা দিল যে, টাকা না দিলে ঘর-দরজা গুড়িয়ে দিবে। উপায় অন্ত না দেখে প্রায় সব টাকা পাওনাদারদের প্রাপ্যের আনুপাতিক হারে দিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। যদিও তাদের পাওনা সর্বসাকুল্যে শোধ হয়নি; এতদসত্ত্বেও এর পর থেকে তাদের উৎপাত মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে। তারা ধরে নিয়েছে যে, এ লেবুর রস সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে; এখন চাপলে আর এক ফোটাও বের হবে না। তাই চাপাচাপির পর্ব আপাতত শেষ। পরিবারের লোকদের মাঝে এদিক থেকে একটু স্বস্তি এলো। এবার শুরু হল পলাতককে খোঁজার পালা। বিভিন্ন জনের মাধ্যমে উড়ো খবর আসে; সঠিক সন্ধান কেউ দিতে পারে না।

এভাবে কয়েক বছর কেটে যায়। তার ছেলে-মেয়েরাও বড় হয়ে উঠছে। মেয়ে তিনটা বড়, তাদের পরে দুটো ছেলে। বড় ছেলেটা হাইস্কুলে পড়ে। পাশাপাশি গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে প্রাইভেট পড়ায়। এতে তার পড়ার খরচের জোগাড় হয়। ইতোমধ্যে তাদের দাদার ইন্তিকাল হয়ে যায়। কিছুদিন পর দাদীও ইন্তিকাল করেন। পরিবারের হাল এখন চাচার হাতে। বাড়ির অন্যরাও যার যার সামর্থ্য অনুপাতে সহানুভূতির ধারা চালু রাখে। সন্তানরা পিতার জীবদ্দশায়ও যেন এতীম। আর তাদের মা স্বামী থাকতেও বিধবা। এভাবে চলছে বছরের পর বছর।

আঁধার রাতের পর ভোর হওয়ার আশা যখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে তখন দূর দূরান্তের সূত্রে জানা যায়, তিনি এখন ঢাকায়ই কোন এক জায়গায় থাকেন। ক'দিন পর জানা গেল তিনি সেখানেও একটা সংসার পেতেছেন। পরিবারের জন্য এ সংবাদ ছিল মেঘের মাঝে বজ্রপাত। সবাই নির্বাক! এ সংবাদ তাদের কাছে অবিশ্বাস্য!

বাস্তবে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। কারণ তিনি তো মেট্রিক পরীক্ষার সময়ে প্রেমের পরীক্ষায় 'বিয়ে' পাস করা লোক। সুতরাং এখন তো তিনি অভিজ্ঞ 'হেড মাস্টার'। কিন্তু সমস্যার কথা হল, এখন এ রোগের লক্ষণ তার সন্তানদের মাঝেও দেখা দিল। বড় মেয়েটা গোপনে পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক সন্তানধারী এক মায়ের সতিন হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। গ্রামে এ নিয়ে ছিঃ ছিঃ চলছে– তাতে তার কোন পরোয়া নেই। বাড়ির লোকেরা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। অবশেষে সালিস দরবার করে ঐ মহিলার স্বামী থেকে দু-লাখ টাকা জরিমানা নিয়ে তাকে সতিনের সংসার থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে তাকে অন্যত্র এক বিপত্নিক লোকের কাছে বিয়ে দেয়া হয়। এখন সে ঐ সংসারেই আছে। প্রায় বিশ বছরের সংসার; নিঃসন্তান! সন্তানের আশাও নেই।

দ্বিতীয় ছেলেটা মাদরাসায় পড়ত। যোগ্য অভিভাবক না থাকায় কিছুদিন পর পড়া ছেড়ে গার্মেন্টসে চাকরি নেয়। থাকা-খাওয়া হত ব্যাচেলর মেসে। মেসে রান্না-বান্না করত এক কাজের বুয়া। কিছুদিন পর সে সেখানে অনৈতিক কাজে অভিযুক্ত হলে অন্যান্যরা তাকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর একপর্যায়ে সে বিদেশ চলে যায় এবং এখনো বিদেশেই আছে।

ছোট মেয়েটার কাহিনীও প্রায় অনুরূপ। বাড়ির পাশে একটা জমি ভরাটের জন্য ট্রাক্টর দিয়ে ভিটা বালি আনার কাজ চলছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পরাসক্তির গুণে সেও ট্রাক্টর ড্রাইভারের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। শেষে ড্রাইভারের সাথেই পালিয়ে যায়। এখন তার সাথেই তার দাম্পত্য জীবন চলছে। শুধু মনের মিল ছাড়া ড্রাইভারের সাথে আর কোন কিছুতেই এ মেয়ের মিল নেই। দরিদ্রের সাথে জুটি বেঁধে এখন সে শুধু মাথা ঠোকরায়।

এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, ছেলে-মেয়ের বিবাহপূর্ব প্রেমের সম্পর্ক এক ধরনের সংক্রামক রোগ। যে এ রোগের শিকার হয়েছে তার পরবর্তী প্রজন্মেও এর সংক্রমণের প্রবল আশঙ্কা থাকে। এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত কোন গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না– এটাই কুদরতের বিধান।

ফিরে আসি ডাক্তার সাহেবের কথায়। ডাক্তার সাহেবের পরবর্তী সংসারেও চার সন্তান জন্ম নিয়েছে। বড় মেয়েটি সাত বছর বয়সে হারিয়ে গেছে। আজো তার কোন হদিস নেই। তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন। স্ত্রীর কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। বিভিন্ন অজুহাতে একটু একটু করে তা বিক্রি করায় এবং স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি মিলে খায়। একপর্যায়ে যখন তার সব শেষ হয়ে যায় তখন তার প্রতি আকর্ষণও কমে যায়। এখন তিনি মহিলাকে ফেলে নিজ বাড়ি ফেরার ফন্দি আঁটেন।

এদিকে এলাকার লোকেরা তার পূর্বের কীর্তি প্রায় ভুলেই গেছে। দেশে এখন মোবাইল ফোনের প্রচলন শুরু হয়েছে। মোবাইল মারফত মাঝে-মধ্যে বাড়ির খোঁজ-খবর নেয়। শত অপরাধের পরও স্বামী বলে কথা! এজন্য প্রথম স্ত্রীকে যখন তিনি ফোন দেন তখন শুরু শুরুতে স্ত্রী অভিমানী হলেও পরে কথায় কথায় দ্বিতীয় স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিজের কাছেই টানতে চেষ্টা করে। সন্তানদেরও একই অবস্থা। অবশেষে প্রথম পক্ষেরই জয় হয়। ডাক্তার সাহেবও তাই চাচ্ছিলেন। শুরু শুরুতে এক-দু দিনের জন্য বাড়িতে আসা-যাওয়া। অবশেষে ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা।

দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি করুণা দেখানোর এখন আর কেউ নেই। স্বামী খোঁজ নেয় না; নেয়ার সুযোগও নেই। বাবা-মা তো পূর্ব থেকেই নেই। মহিলাটি একবার তিন সন্তান নিয়ে স্বামীর বাড়িতে এসেছিল দাম্পত্যের দোহাই দিতে। প্রথম পক্ষের সন্তানেরা তখন ঝাড়ু মিছিল করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। লাঞ্ছনার শিকার হয়ে মহিলাটি যাওয়ার পথে এমন কান্নাকাটি করে যায় যে,

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রসম রেওয়াজ

মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রচলিত বিদ‘আত

মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী

‘ঈসালে সওয়াব’ আরবী শব্দ। ফারসীতে এর প্রতিশব্দ ‘সওয়াব রেসানী’। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রূহে কোন নেক আমলের সওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

ইসলামী শরীয়তে ঈসালে সওয়াব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

অর্থ : কোন মানুষ ইহকাল ত্যাগ করার সাথে সাথে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব সে পেতে থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া (২) উপকারী ইলম ও (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬৩১)

কবর জীবনে মানুষ বড় অসহায়। তারা দুনিয়াতে ছেড়ে যাওয়া স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্বজনেরা তার জন্য কোন নেককাজ করলে তারা এর সওয়াব পান। এটা কবরবাসীর নাজাতের বা মর্যাদাবৃদ্ধির অনেক বড় অবলম্বন। তাই মৃতদের জন্য ঈসালে সওয়াব জীবিতদের কর্তব্য ।

এই কর্তব্যবোধের কারণে মুসলমানগণ নানাভাবে ঈসালে সওয়াব করে থাকেন। কিন্তু সহীহ ইলম না থাকায় কিংবা হঠকারিতা বশত এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন রসম-রেওয়ায, শিরকী-বিদ‘আতী পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যেমন প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম, কাঙ্গালী ভোজ, শবিনা খতম, কুলখানী, চেহলাম, মৃত্যুবার্ষিকী, ফাতেহা খানী, ওরশ শরীফ প্রভৃতি। এর কোনটিই শরীয়ত বর্ণিত পদ্ধতি নয়। এসব পন্থায় আমলকারীর কোন সওয়াব হয় না; উল্টো আয়োজকদের মারাত্মক গুনাহ হয়। নিজেরাই যেখানে সওয়াব পেল না সেখানে মাইয়িতকে কী পৌঁছাবে? এমনকি এর কোন কোন পন্থায় কুফরীরও আশঙ্কা থাকে।

আমরা ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতি তথা বিদ‘আতের অশুভ পরিণতি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

বিদ‘আত

ইবাদতের নামে সওয়াবের পন্থা হিসেবে নব উদ্ভাবিত যে মত বা পথের কোন ভিত্তি বা নমুনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত সোনালী যুগে পাওয়া যায় না, তাই বিদ‘আত।

বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে পাকে কঠোর ধমকি ও ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ এসেছে। উদাহরণত-

১. কোন কোন বিদ‘আতে লিপ্ত হলে মানুষ ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাযির-নাযির ও আলিমুল গাইব মনে করা। এমন আকীদাগত বিদ‘আতের পরিণতি হচ্ছে কুফর।

২. কোন কোন বিদ‘আতে লিপ্ত হলে কাফের না হলেও ফাসেক হয়ে যায়। যেমন, প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম, মাজার পূজা, ঈদে মীলাদুন্নবী, তাযিয়া মিছিল ইত্যাদি। এসব আমলগত বিদ‘আতের পরিণতি হচ্ছে ফাসিক হওয়া।

৩. বিদ‘আতীর পরিণতি জাহান্নাম।

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

অর্থ : হযরত ইবরায ইবনে সারিয়া রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ইবাদতের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকো। কেননা প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয়ই বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৬০৭)

৪. বিদ‘আতের কারণে সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়।

عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهمالى يوم القيامة. اسناده صحيح

অর্থ : হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা বলেন, যখন কোন জাতি বিদ‘আতে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের আমল হতে সমপরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন, যা আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না। (সুনানে দারেমী; হা.নং ৯৮)

অর্থাৎ বিদ‘আত পরিহার না করলে সেই মুর্দা সুন্নাত আর যিন্দা হয় না।

৫. বিদ‘আতীর তওবা নসীব হয় না।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিদ‘আত পরিহার না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তওবাকে বিদ‘আতীদের থেকে প্রাচীর দিয়ে আড়াল করে রাখেন। (মু’জামে আউসাত; হা.নং ৪২০২)

অর্থাৎ বিদ‘আতী ব্যক্তি সওয়াবের কাজ মনে করে তাতে লিপ্ত থাকে। তওবা করার প্রয়োজন বোধ করে না। আর এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। (নাঊযুবিল্লাহ)

৬. বিদ‘আতীর আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তির সমস্ত আমল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যতক্ষণ না সে বিদ‘আত পরিহার করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৫০)

৭. বিদ‘আতী সম্মানের অযোগ্য।

عن ابراهيم بن ميسرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. قال الامام السخاوى اسانيده ضعيفة بل قلا ابن الجوزى كلها موضوعة.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ‘আতীকে সম্মান করল, প্রকৃতার্থে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল। (মু’জামে আউসাত; হা.নং ৬৭৭২)

৮. বিদ‘আতীদের প্রতি আল্লাহর তা‘আলার অভিসম্পাত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله. اسناده ضعيف.

অর্থ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছয় ব্যক্তিকে আমি লা‘নত করি, আল্লাহ তা‘আলা লা‘নত করেন এবং সকল নবীগণ (যাদের দু‘আ কবুল হয়ে থাকে) লা‘নত করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল, কিতাবুল্লাহর বিধানে যে বৃদ্ধি ঘটায়; অর্থাৎ বিদ‘আত আবিষ্কার করে।

৯. বিদ‘আতী হাউজে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৫৭৪৯)

عن عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد على منكم فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن أى رب مني ومن أمتي. فيقول إنك لاتدرى ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাকে বলতে শুনেছি, (হাশরের দিন) আমি হাউজে কাউসারের পাড়ে আগন্তুকের অপেক্ষায় থাকবো। আল্লাহর কসম! সেদিন একদল লোককে আমার দিকে আসতে পথ আটকে দেয়া হবে। তখন আমি গিয়ে বলব, ইয়া রব! এরা তো আমারই উম্মত। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আপনি অবশ্যই জানেন না, আপনার ইন্তিকালের পর এরা কতসব নতুন আমল আবিষ্কার করেছিল এবং এরা আপনার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৯৪)

১০. বিদ‘আত কর্মের মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ দাবী করা হয়।

قال الامام مالك من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.

অর্থ : ইমাম মালেক রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নেক কাজ মনে করে ইসলামের মধ্যে কোন বিদ‘আত আবিষ্কার করল, সে যেন এই ধারণা করল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবওয়াতের দায়িত্বে খেয়ানত করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আজ আমি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। অতএব সে যুগে যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আজো তা দীন বলে গণ্য হবে না। (আল-ই‘তিসাম; পৃষ্ঠা ৪৯)

এছাড়াও আরো কিছু ক্ষতি হলো, বিদ‘আতের কারণে বনী আদমের চির শত্রু শয়তান মহাখুশি হয়, বিদ‘আতের মাধ্যমে ধর্ম বিকৃত হয় ইত্যাদি।

বিদ‘আত উদ্ভাবনের কারণ

ইসলাম একটি সহজ-সরল ধর্ম। ধর্মীয় সকল বিধি-বিধান অনাড়ম্বর–সাদাসিধে। এখানে আনুষ্ঠানিকতা ও প্রথা পালনের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু স্বভাবজাত তাড়নায় মানুষ ধর্মীয় বিধানের বেলায়ও রসম-রেওয়ায, আনুষ্ঠানিকতা-উদযাপন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট। মানবিক এই দুর্বলতার সুযোগে প্রবৃত্তিপূজারী স্বার্থান্বেষী মহল বাহ্যিক চাকচিক্যময় বিভিন্ন কুপ্রথা মুসলিম সমাজে চালু করেছে। এর পেছনে মৌলিক কারণ হচ্ছে-

(১) সম্পদের মোহ, (২) মর্যাদা লাভের আশা, (৩) অজ্ঞতা তথা দীনের সহীহ ইলম না থাকা, (৪) পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ, (৫) প্রসিদ্ধি লাভের প্রবণতা, (৬) ধর্মীয় বিষয়ে নমনীয়তা ও উদারপন্থা অবলম্বন ও (৭) বিজাতীয়দের অনুসরণ প্রীতি।

ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের কারণে হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানদের জীবনাচারেও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সওয়াব রেসানীর জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন, কোন বিশেষ অনুষ্ঠান শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোন সময়ে যে কোন নেক আমল করে তার সওয়াব পৌছানো যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঈসালে সওয়াবের সাথে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান পালন করাকে কথিত ইবাদত হিসেবে রূপ দেয়া হচ্ছে। যেন এগুলো ছাড়া সওয়াব রেসানীর আর কোন পদ্ধতি নেই বা শুধুমাত্র বিভিন্ন দিবসকেন্দ্রিক কিছু গতানুগতিক প্রথা পালন করলেই দায়মুক্ত হওয়া যায়। আমরা এ সকল গর্হিত কাজ থেকে বিরত থেকে পরকালের ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারি।

মীলাদ মাহফিল

আমাদের দেশে সাধারণত কেউ ইন্তিকাল করলে তিনদিন পরে কুলখানীর নামে দু‘আর আয়োজন করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। লোক সমাগম করে ভাড়াটিয়া মৌলবী সাহেবকে দিয়ে মনগড়া কিছু দুরূদ-সালাম, তাওয়াল্লুদ ইত্যাদি পড়ে শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

কেউ কেউ চল্লিশতম দিনে আরেকটি মীলাদের আয়োজন করে চেহলামের নামে। বিশেষ ব্যক্তি হলে মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এতেই যেন যিন্দা-মুর্দা সবাই তৃপ্ত। গ্রামে পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে শহরের বাসিন্দা আপনজন ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। কতদিন ছুটি নিয়ে এসেছেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন, মীলাদ পর্যন্ত আছি; মীলাদটা শেষ করেই চলে যাব। আবার মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ কারো যদি কর্মস্থলে তাড়া থাকে, শুধু জানাযায় শরীক হয়ে চলে যায় তাহলে গ্রামবাসী ভর্ৎসনা করে বলে, কেমন ছেলে! বাপের মীলাদটাও পড়ে গেল না!

কী এই মীলাদ? কোথা হতে এর উদ্ভব?

আগের যুগের মানুষের মাঝে জ্ঞান স্বল্পতার কারণে ধারণা ছিল যে, কেউ মারা গেলে সে বাড়িতে ভূত-প্রেত আছর করে এবং রাতে মৃতের আত্মা দেখা দেয়। কাউকে নাম ধরে ডাকে, কারো কাছে কিছু চায়, ছুৎ লাগে তথা স্পর্শজনিত সমস্যা দেখা দেয়। যে কারণে মরাবাড়িতে গর্ভবতী সদ্য প্রসূতি মহিলা, নবজাতক, ঘা-পাঁচড়ার রোগীকে যেতে দেয়া হয় না। পরিবারের সবার মাঝে একটা অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে। রাতে ঘর থেকে কেউ সাধারণত বের হয় না। ঐ বাড়ির কাছ দিয়ে রাতে কেউ একাকী যেতে ভয় পায়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করতে হয়; তাই তিনদিন এভাবেই থাকবে। এরপর তৃতীয় দিনে মহা ধুমধামে লোক সমাগম করে মীলাদ, খানা-দানার আয়োজনের মাধ্যমে ভূতুড়ে পরিবেশকে স্বাভাবিক করতে হবে। সবার দৃঢ় বিশ্বাস যেন মীলাদটা হয়ে গেলেই শোকের ছায়া কেটে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়। ভূত-প্রেত, প্রেতাত্মা, ছুৎ লাগা সব বিদায় নেয়। এ কারণেই তিনদিনের মাথায় এই মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন; যা শতভাগ হিন্দুয়ানী বিশ্বাস।

মীলাদের ইতিকথা

প্রচলিত মীলাদ প্রথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত সোনালী যুগে তো দূরের কথা ইসলামের প্রথম ছয় শতাব্দী পর্যন্ত এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মসূল শহরের অপব্যয়ী ও প্রবৃত্তিপূজারী বাদশাহ মুযাফ্ফারুদ্দীন আবূ সাঈদ কাউকারী ইবনে আরবিল সর্বপ্রথম রবিউল আউয়াল কেন্দ্রিক এ জাতীয় আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। এ কাজে সে ব্যবহার করে অর্থলোভী, পেটপূজারী এক দরবারী মৌলবী উমর ইবনে মুহাম্মাদ মসূলীকে। সে বাদশাহর চিত্তবিনোদনের খোরাক হিসেবে **১২ই** রবিউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে তিনদিন ব্যাপী মীলাদ-মাহফিলের রূপরেখা তৈরি করে। বাদশাহ রাষ্ট্রীয় লাখ লাখ টাকা অপব্যয় করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। বাদশাহর জন্য বিশেষ ধরনের কয়েক স্তর বিশিষ্ট গম্বুজ

তৈরি করা হত। গম্বুজের প্রত্যেক স্তরে একদল করে গায়ক ও বাদক থাকত। মীলাদের সময় গান-বাদ্যের মাধ্যমে উল্লাস করা হত। বাদশাহ গম্বুজে বসে সস্ত্রীক তা উপভোগ করত। সে নিজেও নৃত্যে অংশ নিত।

সমকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম তীব্র ভাষায় এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কালক্রমে অজ্ঞতা বশত মানুষ যে কোন দু'আ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই মীলাদ-মাহফিলকে বেছে নিয়েছে, বিশেষত মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে।

দুরূদ ও মীলাদ

দুরূদ অর্থ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট খাস রহমত প্রার্থনা করা। এটা কীভাবে কোন সময় করতে হবে তা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে শিখিয়ে গেছেন। হাদীস শরীফে অসংখ্য দু'আ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিসৃত সেসব বরকত পরশিত অর্থবহ দুরূদ বাদ দিয়ে প্রচলিত মীলাদ-মাহফিলে নিজেদের বানানো ব্যাকরণগত মারাত্মক ভুল অর্থ সংবলিত যেসব ছন্দময় বাক্য গানের সুরে সম্মিলিতভাবে পাঠ করা হয়, এগুলো আদৌ দুরূদ নয়। এতে কোন সওয়াবও নেই; বরং অর্থবিকৃতির কারণে উল্টো গুনাহ হয়।

মীলাদ অর্থ

মীলাদের অর্থ হল জন্মকাল। মীলাদ-মাহফিল অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার মজলিস। প্রচলিত মীলাদ-মাহফিলে আরবীতে তাওয়াল্লুদের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকালীন কিছু আলোচনা করা হয় মাত্র। যা অত্যন্ত গর্হিত ও কুরুচিপূর্ণ। উদাহরণত–

ولما تم منه حمله على الراجحة تسعة اشهر القمرية، فجاءها المخاصه فولدته النبى صلى الله عليه وسلم نورا يتلؤلؤ سينا، يا نبى سلام عليك يا رسول سلام عليك...

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃগর্ভকাল যখন নয় মাস পূর্ণ হল, তখন তাঁর মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হল। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূররূপে প্রসব করলেন, যে নূরে সিনাই পর্বত আলোকিত হয়ে ওঠে। ইয়া নাবী সালা মালাইকা...

এরপর বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে একটি করে ছন্দ বলা হয়, আর ফাঁকে ফাঁকে ইয়া নবী সালা মালাইকা, ইয়া রাসূল..., কখনো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা... সম্মিলিত কণ্ঠে পড়া হয়।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, দুনিয়ার কোন বড় ব্যক্তির জীবনী আলোচনা সভায় যদি বলা হয়, তিনি মাতৃগর্ভে এতদিন ছিলেন, এরপর মায়ের প্রসব বেদনা উঠতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন ইত্যাদি, তাহলে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, নাকি হেয় প্রতিপন্ন করা হয়!?

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ইয়া নবী সালা মালাইকা' এর অর্থ হয়, হে জনৈক নবী! আপনার উপরে ফেরেশতাদের উটের নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করা হোক (নাঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ পাক যত স্থানে আমাদের নবীকে সম্বোধন করেছেন সকল স্থানে يا ايها المدثر، يا ايها المزمل، يا ايها الرسول، يا ايها النبى، السلام عليك ايها النبى ইত্যাদি শব্দযোগে করেছেন। এভাবে বলা হলে নির্দিষ্ট করে আমাদের নবীকে বুঝায়। আর 'ইয়া নবী' বললে অনির্দিষ্টভাবে কোন একজনকে বুঝায়।

ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা অন্য মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলা ফরযে কিফায়া করে দিয়েছেন। সকলের পক্ষ হতে কয়েকজন করলে সকলের ফরয আদায় হয়ে যাবে। যাকে আমরা জানাযার নামায হিসেবে জানি। এটি মূলত দু'আ। এখানে আযান-ইকামত, রুকূ-সিজদা, কিরাআত কিছুই নেই। তবে দু'আটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নামাযের আকৃতিতে করা হয়। জানাযার আগে বা পরে অন্য কোন সম্মিলিত দু'আর নির্দেশও শরীয়তে নেই। দাফনের পর যিয়ারতের নিয়তে দু'আ হতে পারে। এটাও কোন আবশ্যিক বিষয় নয়। দাফনের পর সকলের দায়িত্ব হল, ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর বিভিন্ন নফল ইবাদত-বন্দেগী করে তার ঈসালে সওয়াব করা। কিন্তু দু'আর নামে তিনদিনা, চল্লিশা বা মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি দিবস কেন্দ্রিক আয়োজন, লোক সমাগম করা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

সমাজের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন সওয়াব রেসানী অর্থই হচ্ছে মীলাদ। অথচ সওয়াব রেসানীর সারকথা হচ্ছে নিজে কোন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করে তা মৃতের রূহে পৌঁছানোর দু'আ করা। এর জন্য অন্যান্য সকল নেক আমল করা যেতে পারে। বেশি বেশি নামায পড়া, নফল রোযা রাখা, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে গরীব তালিবে ইলমদের দীনী শিক্ষা কাজে সহযোগিতা করা, সদকায়ে জারিয়া করা, কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

কিন্তু আফসোস! আমাদের সবকিছু শুধু মীলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিজেরা কুরআন তিলাওয়াত না করে মীলাদে বরকত লাভের জন্য ভাড়াটিয়া হাফেয নিয়ে চুক্তিভিত্তিক শবিনা খতম, কুরআন খতম পড়ানো হয়। সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে টাকার বিনিময়ে খতম পড়লে তিলাওয়াতকারী নিজেই বিন্দুমাত্র সওয়াব পায় না। তাহলে সে মৃতের জন্য কী পাঠাবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا.

অর্থ : আর তোমরা আমার আয়াতকে স্বল্পমূল্যে (দুনিয়ার বিনিময়ে) বিক্রি করো না। (সূরা বাকারা- ৪১)

এভাবে খতমের আয়োজন করাও হারাম। এর সঠিক পদ্ধতি হল, যেসব মাদরাসায় হিফয বিভাগ রয়েছে সেখানে গিয়ে খতমের ব্যবস্থা করা। খতমের পারিশ্রমিক হিসেবে কাউকে কিছু না দেয়া। হ্যাঁ, সম্ভব হলে মাদরাসায় দান করা এবং এতেও মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবেন।

তাছাড়া প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল তথা রাসূলের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার মধ্যে উম্মতের জন্য আদর্শ বা অনুসরণীয় কিছু নেই। কেননা রাসূল আর দ্বিতীয়বার ঐভাবে দুনিয়াতে আসবেন না। কোন উম্মতও রাসূলের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হতে পারবে না। মূল আলোচ্য বিষয় হতে পারে সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; অর্থাৎ রাসূলের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন, তার উন্নত চরিত্র মাধুর্য, উম্মতের প্রতি সহমর্মিতা, দীনের জন্য সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি। সীরাতের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে উম্মতের জন্য জীবন পথের পাথেয়, জান্নাত লাভের সঠিক নির্দেশনা, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। আর এসব আলোচনা মানুষের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। বরং এটা হওয়া উচিত মুমিনের গোটা জীবনের কর্মসূচী।

মানুষের মৃত্যুতে রাসূলের জন্ম আলোচনা! মৃত্যুর সাথে জন্ম আলোচনার কী যোগসূত্র! কী বা এর রহস্য?! এটা মূলত আবিষ্কার করা হয়েছিল **১২ই** রবিউল আউয়ালে (তাদের ধারণা

অনুযায়ী) রাসূলের জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষে। কিন্তু অজ্ঞতা, মুর্খতা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ প্রীতি, আমজনতার সমর্থন আদায়, হাদিয়া-নযরানায় পকেট ভারি করা ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে এই মীলাদকে মৃত্যুকেন্দ্রিক উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

তবারক বিতরণ, জিয়াফত ও কাঙ্গালী ভোজ

অনেকে ঈসালে সওয়াবের জন্য কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করেন। দিন, তারিখ নির্ধারণ না করে যে কোন সময় গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানো অনেক বড় সওয়াবের কাজ। সমাজে এসব ভোজ আয়োজনে প্রকৃত কাঙ্গাল কয়জন থাকে বা তাদেরকে কিভাবে সমাদর করা হয় সেটা দেখার বিষয়। ধনী-গরীবের ভেদাভেদের এই সমাজে শহরের লোকেরা বাড়ির গেটে দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করিয়ে গরীবের হাতে একটা খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দেয়া হয়। আর ধনাঢ্য অতিথিদেরকে ঘরে নিয়ে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে উঠোনের মাটিতে কলাপাতায় গরীব-মিসকীনদেরকে খেতে দেয়া হয়। দুই হাঁটু মুড়ে বসে দু'মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে তারা বিদায় নেয়। আর ধনী লোকদের জন্য ভেতরে থাকে বিশেষ আয়োজন। সারা বছর যাদের ভালো খাবার জোটে না সেই গরীব-মিসকীনদের এই মূল্যায়ন আর সবসময় যারা ভালো-মন্দ খেয়ে অভ্যস্ত তারাই তখন প্রধান কাঙ্গাল সাজেন। এ জাতীয় ভোজ অনুষ্ঠানে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। তাই এ ধরনের আয়োজন করাও ঠিক নয়। মানুষ যতই সওয়াবের নিয়তে করুক না কেন, এসবের পিছনে থাকে সামাজিক চাপ ও খ্যাতি লাভের আশা। বাবা মারা গেছেন, অনুষ্ঠান না করলে মানুষ কী বলবে!

অনেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে থাকে, কত খরচ করেছে, কত লোকের আয়োজন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের উদ্দেশ্য সুখ্যাতি অর্জন। তাই যদি সত্যিকারার্থে ঈসালে সওয়াবের ইচ্ছা থাকে তাহলে এই অর্থ গরীব-এতীমদের মাঝে দান করা বা মাদরাসা-মসজিদে দান করা অধিক ফলপ্রসূ। খানার আয়োজন পারতপক্ষে না করাই ভালো। কারণ খানার অনুষ্ঠানের মধ্যে আরো মারাত্মক কয়েকটি খারাপ দিক রয়েছে-

১. কেউ মারা গেলে ভোজ অনুষ্ঠান এটা মূলত হিন্দুয়ানী প্রথা; ফলে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।

২. আনন্দের সময় খানার আয়োজন শরীয়তসম্মত। কিন্তু শোকের মুহূর্তে দাওয়াত শরীয়তের চাহিদা নয়। বরং শোকার্তের ঘরে খাবার পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

৩. এই খাবার আয়োজনকে বাধ্যতামূলক মনে করা হয়; যা সম্পূর্ণ বিদ'আত।

৪. কখনো কখনো এতীম ওয়ারিসের মাল খাওয়া হয়, যা কারো জন্য বৈধ নয়। এতীম অনুমতি দিলেও শরীয়তে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

অর্থ : যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল ভোগ করে তারা মূলত জাহান্নামের আগুনে উদরপূর্তি করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা-১০)

অতএব মৃতের জন্য দু'আ করতে হলে খালেস আল্লাহর জন্য হতে হবে, যেখানে কোন বিনিময় থাকবে না। প্রচলিত দিন-তারিখের অনসরণ থাকবে না। দু'আর সাথে খাবারের কোন সম্পর্ক থাকবে না। অনেকে বলেন, বাড়িতে মেহমান আসলে তো মেহমানদারী করতে হয়, তাই কিছু খানার আয়োজন করা হয়। তাদের মূল কথায় ফিরে আসতে হবে। তারা তো মেহমান হিসেবে আসেনি; ডাকা হয়েছে। এসব লোক সারা বছর কেন মেহমান হন না! তিনদিনা, চল্লিশায় কেন তারা মেহমান হচ্ছেন!?

কেউ বলেন, যারা আসে তারা খাবারের শর্ত করে না। আমরা স্বেচ্ছায় খাওয়াই। এক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, المعروف كالمشروط (সমাজে প্রচলিত বিষয়ের শর্ত করা না হলেও তা আপনাআপনি শর্তযুক্ত হয়ে যায়)। সমাজের সকলের জানা আছে মীলাদ-মাহফিলে গেলে খানার ব্যবস্থা থাকে। তাই মীলাদে আসার উদ্দেশ্যই খেতে আসা। পরীক্ষা করে দেখুন, গরু জবাই করলে বিনা প্রচারে হাজারো লোক হাজির। আর সামান্য জিলাপীর ব্যবস্থা করলে দেখুন না কতজন আসে! একটু হিম্মত থাকলে লোকচক্ষুর তোয়াক্কা না করে কোন খানার আয়োজন ছাড়াই দু'আ মাহফিলের ঘোষণা দিন, সপ্তাহখানেক ধরে প্রচার করুন। দেখুন, মীলাদ-মাহফিলের কোরাম পূরণ হয় কিনা। কয়জন লোক খুঁজে পাওয়া যায়? বাস্তবতা হল, মানুষ খবর রাখে কোন মীলাদে কী আয়োজন হচ্ছে। খাবারের মান অনুযায়ী অনুষ্ঠানে লোক সমাগম হয়।

অনেক অঞ্চলে দেখা যায়, কোন গরীব লোক মারা গেলে আত্মীয় ও পাড়া-পড়শীরা চাঁদা তুলে মীলাদ দেয়। কী আশ্চর্য! মীলাদ কী এমন ফরয বিধান, যে এর জন্য চাঁদা উঠাতে হবে! মীলাদকে মনে করা হয় সামাজিক দায়। সে দায়মুক্তির জন্যই এই দায়সারা চাঁদাবাজি! কেন? পারলে তার জন্য মহল্লাবাসী সবাই মিলে দু'টি করে নফল রোযা, দশ রাকাআত করে নামায, এক পারা করে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ-দুরূদ ইত্যাদি করে দিন! এটাকে কোন দায়িত্বই মনে করা হয় না। আসল কাজের বেলায় খবর নেই; নিজের ভোজোৎসবের জন্য মীলাদ নিয়ে তোড়জোড়। আসলে সব পেটপূজা। এগুলো স্বার্থান্বেষী মহলের আবিষ্কার; নিজের বাজার চাঙ্গা রাখার জন্য তারা এসব কুপ্রথা সমাজে জিইয়ে রেখেছে।

মীলাদের খাবারের নাম দেয়া হয়েছে 'তবারক' তথা বরকত পরশিত। এজন্য এটা খুব আগ্রহভরে গ্রহণ করা হয়। অসুস্থকে শিফা মনে করে খাওয়ানো হয়। যুক্তি খাড়া করে– ভক্তিতে মুক্তি। জেনে রাখা দরকার, যে আমল কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস তথা শরীয়তের চার মূলনীতি সমর্থিত নয় তা আপাতদৃষ্টিতে যত সুন্দরই মনে হোক, যত ভক্তি ভরেই করা হোক, যতই ইশকে রাসূল ও আবেগপূর্ণ হোক না কেন তা বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা। এর মাঝে কোন বরকত বা শিফা থাকতে পারে না। বরং পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বিদ'আতীর উপর আল্লাহ তা'আলা এবং নবীগণের লা'নত বর্ষিত হয়। অতএব বিদ'আতী আমলের খানাও লা'নতের বস্তু হবে। তা ভক্ষণ করে কেউ (আপনা আপনি) সুস্থ হয়ে থাকলেও তার আত্মা চরমভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তার অন্তরে বাসা বাঁধবে নিকষ কালো অন্ধকার।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এক চিঠিতে লিখেছেন, এই অধম বিদ'আতের কোনটির মাঝেই সৌন্দর্য দেখতে পায় না। শুধু অন্ধকার, পঙ্কিলতা ও ত্রুটিই অনুভব করে। যদি আপাতদৃষ্টিতে কোন বিদ'আতীর নিকট কোন কোন বিদ'আতে কল্যাণ ও সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়ও কিন্তু যখন তার আত্মশক্তি বলিষ্ঠ হবে তখন সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এর পরিণাম একমাত্র ধ্বংস ও বঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দীনের সঠিক উপলব্ধি দান করুন এবং সর্বপ্রকার শিরক-বিদ'আত হতে হিফাযত করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মাওলানা কারী মুনীরুজ্জামান
বাঁশবাড়ী জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২২৮ প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে টুপি ছাড়া নামায পড়া একটি ফিতনার আকার ধারণ করেছে। লা-মাযহাবী ভাইয়েরা টুপি পরাকে ভিত্তিহীন বলে থাকে।
টুপি পরার ব্যাপারে সরীহ তথা সুস্পষ্ট কোন রেওয়ায়াত বা প্রমাণ থাকলে হাওয়ালাসহ জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : টুপি পরিধান করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি শি‘আর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাযি., তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ী এবং পরবর্তীতে সব যুগেই মুসলিমগণ তা পরিধান করেছেন। টুপি পরিধান সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একটি ধারাবাহিক আমল। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘আমলে মুতাওয়ারাস’। হাদীসে, আসারে ও ইতিহাসের কিতাবে টুপি বিষয়ে বহু তথ্য রয়েছে। এমন প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়কে যারা ভিত্তিহীন মনে করে তারা চরম মূর্খতার শিকার। কিংবা চরম ফিতনায় নিমজ্জিত। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু রেওয়ায়াত পেশ করা হচ্ছে-

১. আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب.
(সূরা হজ্জ- ৩২)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. হতে বর্ণিত,
أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
(সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫৪৩)

এ হাদীসে শুধু ইহরাম অবস্থায় মাথা খালি রাখতে বলা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল, ইহরাম ছাড়া সাধারণ অবস্থায় মাথায় টুপি থাকবে।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯২৫)

এ হাদীসে দ্রুততার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামা, মোজা, জুতা ও টুপি পরিধান ব্যতীত রোগী দেখতে চলে গিয়েছেন। বোঝা গেল, আকস্মিক কোন ঘটনা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সাধারণত টুপি পরিধান করেই থাকতেন।

৪. আবূ ইয়াযীদ খাওলানী হতে বর্ণিত, তিনি ফুযালা ইবনে উবাইদ আনসারী হতে শুনেছেন, তিনি বলেন,
سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة فمؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقاتل حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوة كانت على رأسه أو على رأس عمر فهذا في الدرجة الأولى ورجل مؤمن جيد الإيمان إذا لقي العدو كأنما يضرب جلده شوك الطلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهذا في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط وأشار صالحا وآخر سيئا لقي العدو وصدق الله مولاه فهذا في الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه فلقي العدو فقاتل حتى قتل فهذا في الدرجة الرابعة.
(মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী; হা.নং ৫০)

৫. আবূ জা’ফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রুকানা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,
أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৮৪)

৬. সুলাইমান ইবনে আবূ আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
عن سليمان بن أبي عبد الله قال أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر يضع أحدهما العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعني على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه.
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৪৯৮৭)

মুহাম্মাদ মুজ্জাম্মেল হক
কাওরাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর

২২৯ প্রশ্ন : (ক) আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। আমার দোকানে ছবিসহ ছোট ছোট পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন আইসক্রিম, সাবান ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, এই কারণে আমার দোকানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে কিনা?

(খ) সকালে দোকান খোলার পর অনেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে (যেমন দোকান পাক করা বা বরকত হাসিল করা) গোলাপজল ছিটিয়ে থাকে। শরীয়তে এর বিধান কি?

উত্তর : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে সকল ঘরে কুকুর বা কোন জানদার প্রাণীর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।
সেই ভিত্তিতে আমাদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাটেও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খোলামেলা ছবি রাখা হয় এবং সম্মানজনক অবস্থায় রাখা হয় তাহলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। তবে যদি ছবিকে সম্মানজনক অবস্থায় রাখা না হয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদর্শন করা না হয় যেমন কোন কোম্পানীর ট্রেডমার্ক, লোগো, কার্টুন যেগুলো বিভিন্ন পণ্যের প্যাকেটের উপর থাকে যদি সেগুলোকে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য না হয় বরং যথাসম্ভব ঢেকে রাখা হয় ফ্লোরে-তাকের নিচে ছবির দিক পিছনে ঘুরিয়ে রাখা হয় তাহলে আশা করা যায় যে, সে দোকানেও রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে।
আর যদি সেই ছবিগুলোকে সম্মান করা বা লোকদেরকে আকর্ষণ কিংবা স্মৃতি হিসেবে উন্মুক্ত রাখা হয় তাহলে অবশ্যই কবীরা গুনাহ হবে এবং রহমতের ফেরেশতার আগমনে বাধা হবে। (সূরা হজ্জ- ৭৮, সূরা বাকারা- ২৮৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪০০২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৯৫০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩০৫, ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়িমা ১/৭২০)

(খ) বরকত হাসিলের জন্য সকাল-সন্ধ্যা ঘর-বাড়িতে, দোকান-পাটে আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপজল ছিটানো ইত্যাদির কোন ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহয় নেই। তাই এগুলো পালন করা জায়েয নেই। এ রসম মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পালন করে থাকে। মুসলমানেরা এ প্রথা তাদের কাছ থেকেই আমদানী করেছে।

গোলাপজল এক ধরনের সুগন্ধি মাত্র, যা ব্যবহারে পরিবেশ স্নিগ্ধ ও সুগন্ধময় হয়। সকাল-সন্ধ্যা এ পানি ছিটালে বরকত হওয়ার কথা কুরআন-সুন্নাহর কোথাও উল্লেখ নেই। কাজেই বরকতের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করলে বিদআত হবে। আর হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা তো আছেই, যা নাজায়েয।

মুমিন বান্দা তো বরকত কামনা করবে নেক আমলের মাধ্যমে ও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। হাদীস শরীফে সকাল-সন্ধ্যায় পাঠের জন্য অনেক দু'আ বর্ণিত আছে। নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে বা কোন আলেমের কাছ থেকে জেনে সে সব দু'আর আমল করবে। (সূরা ইবরাহীম- ৭, সূরা শূরা- ১২, সূরা মুমিন- ৩, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪২, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫০৭৩, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/২২৩, ফাতাওয়া শামী ১/৫৬০)

হাফেয মাওলানা গাজী আল-মাহমূদ
গাজীপুর

২৩০ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছেন। এখন জানার বিষয় হল, উক্ত বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ এ যাবত এক তলা পরিপূর্ণ হয়েছে। অতএব ঐ বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলাকে অস্থায়ীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামাযের জন্য নির্ধারণ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো সর্বাবস্থায় সহীহ হবে। তবে জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে (তথা ১. শহর বা শহরতুল্য গ্রাম হওয়া, ২. নির্ধারিত ইমাম বা নায়েব থাকা, ৩. যোহরের সময় হওয়া, ৪. খুতবা দেয়া, ৫. ইযনে আম (সংশ্লিষ্ট সকলের প্রবেশের অনুমতি) থাকা, ৬. জামাআতের সাথে আদায় করা।) সে সকল শর্ত পাওয়া গেলে উক্ত জায়গায় জুমু'আর নামাযও সহীহ হবে। এ সকল শর্তের উপস্থিতিতে জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য স্থায়ী মসজিদ হওয়া আবশ্যক নয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৩৮, হাশিয়াতুত তাহতাবী; পৃষ্ঠা ৫১৩, ফাতাওয়া শামী ২/১৩৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৯/২৫৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৮৩)

আব্দুল্লাহ
কুস্তাবন্দর জামে মসজিদ, মানিকগঞ্জ

২৩১ প্রশ্ন : 'আত্মশুদ্ধির জন্য যিকিরের বিকল্প নেই' কথাটি কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

উত্তর : 'আত্মশুদ্ধির জন্য যিকিরের বিকল্প নেই' কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কেননা আত্মশুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্রতা লাভ করা। অর্থাৎ অন্তরকে রোগমুক্ত করা এবং এটি ফরয। আর যিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করা এবং অন্তরকে তাজা করা। প্রথমটির উদাহরণ হল অপারেশন আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল ভিটামিন। রোগীর জন্য ভিটামিনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভিটামিন দ্বারাই রোগের চিকিৎসা যেমন হয় না তেমনই শুধু যিকিরের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় না। বরং আত্মশুদ্ধি-সম্পন্ন কোন শাইখের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে হবে এবং যিকিরও শাইখের পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত। মোটকথা, যিকির আত্মশুদ্ধির একটি অংশ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু যিকিরই আত্মশুদ্ধি নয়। (মাসাইলুস সুলূক; পৃষ্ঠা ১৭১, তাফসীরে মাযহারী ৩/১৩০, ৫/৫৩৬, তাফসীরে রূহুল বায়ান ৬/৬৮, ফাতাওয়া শামী ১/৪৩, ইবনে তাইমিয়া ওয়াত-তাসাওউফ; পৃষ্ঠা ৩৭৪, বাসাইরে হাকীমুল উম্মত; পৃষ্ঠা ৫৬, ৯৯, ১২২)

লিয়াকত খান
ধানমন্ডি, ঢাকা

২৩২ প্রশ্ন : নামায শেষে নামাযী ব্যক্তি ডানে-বামে সালাম ফেরানোর সময় তার চেহারা কখন থেকে ঘোরাবে? এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণিত আছে কি?

উত্তর : নামায শেষে সালাম ফেরানোর সুন্নাত পদ্ধতি :

নামাযী ব্যক্তি উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করবে এবং 'আস্‌সালামু' বলা পর্যন্ত চেহারা কিবলার দিকে রাখবে। 'আলাইকুম' বলার সময় প্রথমবার ডান কাঁধের দিকে, তারপর দ্বিতীয়বার বাম কাঁধের দিকে চেহারা ঘোরাবে।

আর মুক্তাদী হলে উপরোক্ত নিয়মে ইমাম সাহেব ডান দিকে চেহারা ফেরানোর পর মুক্তাদী ডান দিকে সালাম শুরু করবে, বাম দিকে চেহারা ফেরানোর পর বাম দিকে সালাম শুরু করবে। (সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী ২/২৫৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৬, ৭৭, ফাতাওয়া শামী ১/৫২৪, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩১৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৯৫, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/৩৬৯, আল-মাবসূত ১/৩০, দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/৭৯, ফিকহুল ইবাদাত আলাল-মাযহাবিল হানাফী; পৃষ্ঠা ৮৮)

ইঞ্জিনিয়ার শেখ শামীমুল ইসলাম
টেকঢালীবাড়ী, ভাটারা, ঢাকা

২৩৩ প্রশ্ন : (ক) মসজিদের নির্মাণ কাজের জন্য বা মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে সদকার টাকা দেয়া যায় কিনা?

(খ) কেউ যদি কোন নেক আমল করে কোন এক ব্যক্তির রূহে বখশিশ করতে চায় তবে কি আদম আ. থেকে শুরু করে সব মৃত ব্যক্তির রূহে বখশিশ করে তারপর করতে হবে? যদি এমনই নিয়ম হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির প্রত্যেকেই কি বখশিশকৃত আমলের সমপরিমাণ নেকী পাবেন, নাকি যার জন্য আমল করা হয়েছে শুধু তাকেই বখশিশ করার নিয়ত করবে?

উত্তর : (ক) প্রশ্নে শুধুমাত্র সদকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখানে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সদকা শব্দের অর্থ দান। ইসলামে দান কয়েক প্রকার হয়- (১) ফরয দান; যেমন যাকাত, (২) ওয়াজিব দান; যেমন সদকাতুল ফিতর, মান্নত ও কাফ্ফারার টাকা এবং (৩) নফল দান; যেটা যাকাত-ফিতরা ব্যতীত স্বেচ্ছায় দেয়া হয়।

মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে ফরয, ওয়াজিব ও নফল তথা সব ধরনের দান প্রদান করা জায়েয আছে। তবে মসজিদ নির্মাণ কাজের জন্য শুধু নফল দান দেয়া যাবে। এই কাজে ফরয ও ওয়াজিব দান প্রদান করা জায়েয নেই। তেমনিভাবে মাদরাসার নির্মাণ কাজ ও সাধারণ ফান্ডেও নফল দান ছাড়া অন্য ধরনের অনুদান জায়েয নেই। (সূরা তাওবা- ৬০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৩-৩৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৯১)

(খ) নেক আমল করে এক বা একাধিক জীবিত বা মৃত মুসলমানের নামে তার ঈসালে সওয়াব করা বা বখশে দেয়া বৈধ

আছে (তবে কোন অমুসলিমের নামে ঈসালে সওয়াব করা বৈধ নয়)। এক্ষেত্রে হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে সকল মৃত মুসলমানের নামে ঈসালে সওয়াব করা কোন আবশ্যকীয় বিষয় নয়। তবে উত্তম বটে। কেননা ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা পছন্দনীয়।

একাধিক ব্যক্তিকে ঈসালে সওয়াব করার ক্ষেত্রে পরিমাণের ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক মত অনুযায়ী সকল মৃত ব্যক্তির মধ্যে উক্ত সওয়াব বণ্টন করে দেয়া হবে। আর অন্য মতে প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে উক্ত আমলের পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে। সুতরাং কোন একটি মতকে সুনির্দিষ্ট ধরে নেয়ার সুযোগ নেই। তবে হযরত থানবী রহ. এর তাহকীক অনুযায়ী দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২০৩, ফাতাওয়া শামী ২/২৪৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৪১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৩৫০)

আবূ আহমাদ মাইমুন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৩৪ প্রশ্ন : এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদের কাজে ও এক মাদরাসার টাকা অন্য মাদরাসার কাজে ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর : যদি মসজিদ ও মাদরাসার ফান্ডে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থাকে যা ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে অন্য অস্বচ্ছল মসজিদ ও মাদরাসায় দেয়া যাবে যদি দাতাদের কোন আপত্তি না থাকে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৭৯, ৪/৩৫৮-৩৬০, ইমদাদুল আহকাম ৩/১৮৯, ২৭৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/৪৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/১৪১)

হাবীবুর রহমান
আরমানিটোলা, ঢাকা

২৩৫ প্রশ্ন : (ক) আমি হজে গিয়ে অন্য মাযহাবের মত এক মিসিলের সময় আসরের নামায আদায় করেছি। শুনেছি উক্ত সময় আসরের নামায হয় না। তাহলে এই নামাযের হুকুম কি?

(খ) অনেক সময় নিজের অজান্তে দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা না পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেলি, এতে কি আমার নামায পুনরায় আদায় করা লাগবে?

উত্তর : (ক) সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হল, আসরের ওয়াক্ত কোন বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়ার পর শুরু হয়। সে হিসেবে আপনার শুনা কথাটি সঠিক। তবে হারামাইনের ইমামগণ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় তারা ছায়া একগুণ হওয়ার পরপর আসর পড়িয়ে থাকেন। সেখানে আমাদের জন্য ভিন্ন জামাআত করার প্রয়োজন নেই। সেখানে হাম্বলী মাযহাবের ইমামের পিছনে তাদের মাযহাব অনুযায়ী নামায আদায় করে নিলে কোন সমস্যা নেই। নামায আদায় হয়ে যাবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৯৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬, কিতাবুল মাবসূত ১/২৮৯-২৯০, আল-হিদায়া ১/৮১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/২১০)

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় যখনই স্মরণ হবে, সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে। তাশাহহুদ শুরু করার পর যদি তিন তাসবীহ পরিমাণ পড়া হয়ে যায় (যা ايها এর ه পর্যন্ত হয়), তাহলে সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হবে। আর সিজদায়ে সাহু না করে থাকলে নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আর পড়া আবশ্যক নয়। ইস্তিগফার করে নিলেই চলবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৯৭, আল-বাহরুর রায়িক ১/৫১৫, ফাতাওয়া শামী ২/৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩৫-৩৬)

আব্দুল কাদের

২৩৬ প্রশ্ন : আমার আম্মা নিয়ত করেছেন, যদি আমার ভাতিজা সুস্থতার সাথে জন্মগ্রহণ করে এবং মা ও বাচ্চা উভয়ে বেঁচে থাকে, তাহলে একটি জন্তু কুরবানী করবেন। কিন্তু দেখা গেল আমার ভাতিজা সপ্তম মাসে জন্মগ্রহণ করে অপরিপক্কতার কারণে এক সপ্তাহ N.I.C.U তে থাকার পর মারা যায়; তবে বাচ্চার মা সুস্থ আছে। এখন কি সেই কুরবানীটি ওয়াজিব হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে যেহেতু শর্ত পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি, এজন্য মানত আদায় করা ওয়াজিব নয়। (সূরা হজ- ২৯, সূরা বাকারা- ২৭, সূরা মায়িদা- ২৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৬৯৬, ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৯, ৩/৭৩৫, ৭৪০, কাওয়াইদুল ফিকহ; পৃষ্ঠা ৩০৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/১৩৪)

মুহাম্মাদ বাবর আলী শেখ
শ্রীপুর, গাজীপুর

২৩৭ প্রশ্ন : আমার নাতি এক বছর বয়সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময় আমি এভাবে মানত করি যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার নাতিকে সুস্থ করে দেন, তাহলে আমি একজোড়া খাসী জবাই করে শুক্রবার দিন মসজিদের মুসল্লীদের খাওয়াবো।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার নাতি অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে। এখন আমি আমার মানত পুরা করেছি। তবে ঐ দুই খাসীর মধ্যে নাতির আকীকারও নিয়ত করেছি। এখন আমার জানার বিষয় হল, মানতের খাসী দিয়ে এভাবে আকীকা করা জায়েয হয়েছে কিনা? আমাকে কি আবার আকীকা করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে যেহেতু একজোড়া খাসী জবাই করার মানত করা হয়েছে, তাই দু'টো খাসীর পূর্ণ অংশই মানত হয়েছে। কাজেই সেগুলোর গোশত শুধু যাকাত পাওয়ার যোগ্য গরীবদের মধ্যেই বণ্টন করে দিতে হতো। 'শুক্রবার' ও 'মুসল্লী'দের মাঝে সীমাবদ্ধতা জরুরী ছিল না। যে কোন এক দিন যে কোন গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানোর দ্বারা মানত আদায় হয়ে যেত। মানতের গোশত ধনীদের খাওয়া বা খাওয়ানো জায়েয নেই। সুতরাং যে পরিমাণ গোশত ধনীরা খেয়েছে, সে পরিমাণ গোশতের আনুমানিত মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

আর যেহেতু উক্ত দুই খাসী দ্বারা মানত পূর্ণ করা হয়েছে, তাই এর মধ্যে আকীকার নিয়ত করা সহীহ হয়নি। কাজেই আকীকার সুন্নাত পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। (সূরা বাকারা- ২৭, ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৯, ৩/৭৪০, ৭৪১, ৬/৩২০, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ৫/২২৭, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩০/২৮০, কাওয়াইদুল ফিকহ; পৃষ্ঠা ৩৮৬, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৩/৪২৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/১৪৬)

মঈনুল হক খান
কাটাসুর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৩৮ প্রশ্ন : আমাদের পিতা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি পেশায় একজন আয়কর উপদেষ্টা ছিলেন। ইন্তিকালের সময় তিনি ঢাকার মুহাম্মাদপুরের কাটাসুরে ৩ কাঠা জমিতে অর্ধেক অংশে একতলা পাকা বিল্ডিং ও

বাকী অর্ধেকাংশে টিনশেড ঘর রেখে যান। সে সময়ের বাজার মূল্য হিসাব করলে বাড়ির মূল্য আনুমানিক **২২** লাখ টাকার মত হত। এছাড়া গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানার বেরুয়া গ্রামে পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত জমির মধ্যে আনুমানিক ৬ বিঘা পতিত চালা উঁচু জমি এবং আনুমানিক ১০ বিঘা ফসলী/কৃষি জমি রেখে যান। গ্রামের জমির আনুমানিক বাজার মূল্য হিসাব করলে **১২** লাখ টাকার মত হত। আর নগদ ব্যাংক ব্যালেন্স তেমন ছিল না। আমাদের পিতার কোন ধার-দেনা ছিল না এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও মোটামুটি চলনসই ছিল। আমরা মোটামুটি স্বচ্ছল ও মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত।

এখন জানার বিষয় হল, আমাদের পিতার উপর কি হজ ফরয ছিল? ইন্তিকালের আগে তিনি হজ করেননি বা বদলী হজ করার জন্য বলেও যাননি, অসীয়তও করেননি।

এদিকে আমাদের মাতা **১১** বছর ধরে ব্রেইন স্ট্রোকে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হলেও আল্লাহর রহমতে এখনও তিনি জীবিত আছেন। তার বয়স আনুমানিক ৭২ বছরের মত। আমাদের মায়ের নামে ঢাকায় নিজস্ব একটি জায়গা আছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকার মত। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা ভাড়া পান। এছাড়া ঢাকার মুহাম্মাদপুরের কাটাসুরে আমাদের পৈত্রিক নিজস্ব বাড়িতে তার অংশ আছে এবং সেখানে যৌথ পরিবারে তিনি বসবাস করেন। এখান থেকে আমরা ভাড়া পাই ২২ হাজার টাকার মত। আমাদের মাতার কোন ধার-দেনা নেই এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আর তার ঔষধপত্র ছাড়া তেমন কোন খরচাদিও নেই। এছাড়া গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানার বেরুয়া গ্রামে পৈত্রিক ও মাতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি দেড় বিঘা ফসলী জমি পেয়েছেন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা। এছাড়া তিনি আমার পিতার নিকট থেকেও প্রায় ২ বিঘা ফসলী জমি পেয়েছেন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮ লাখ টাকা। অসুস্থ হওয়ার পূর্বেও তিনি এসকল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এখন জানার বিষয় হল, আমাদের মায়ের উপর কি হজ ফরয হয়েছে?

যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের সন্তান হিসেবে আমাদের করণীয় কী? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনাদের পিতার উপর যেমন হজ ফরয ছিল তেমনি আপনাদের মায়ের উপরেও হজ ফরয। ইন্তিকালের পূর্বে পিতা হজের ওসীয়ত করে যাননি। বিধায় তার পক্ষ থেকে হজ করা জরুরী নয়। তবে আপনাদের মধ্য থেকে কেউ নিজ উদ্যোগে পিতার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দিলে অথবা সকলে মিলে কিংবা এককভাবে অন্য কারো মাধ্যমে হজ আদায়ের ব্যবস্থা করলে আশা করা যায় আপনাদের পিতা ফরয হজ আদায়ের গুনাহ থেকে মুক্তি পাবেন।

আর আপনাদের মা বর্তমানে যেহেতু মা'যূর; নিজে হজ করতে সক্ষম নন। অতএব মায়ের নির্দেশে তার সম্পত্তি থেকে অন্য কেউ বদলী হজ আদায় করে দিলে মায়ের ফরয হজও আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫১৩, ১৮৫২, ফাতহুল কাদীর ২/৪১০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮৩, ২৮৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৫৫৯, ৫৬০)

আব্দুল্লাহ
কুস্তাবন্দর জামে মসজিদ, মানিকগঞ্জ

২৩৯ প্রশ্ন : (ক) যিলহজের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে ঈদুল আযহার কুরবানী পর্যন্ত যে ব্যক্তি নখ কাটবে না এবং কুরবানীর পরে নখ কাটবে, এমন ব্যক্তির উপর যদি কুরবানী ওয়াজিব না হয় এবং সে কুরবানী না-ও করে তাহলে সে কুরবানী করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব এবং কুরবানী করে সে একটি কবুল হজের সওয়াব পাবে। এ মাসআলার ব্যাপারে কুরআন-হাদীস মোতাবেক জানতে চাই।

(খ) নফল যিকির-আযকারে ইমামত এবং ইকতিদা বৈধ কিনা। অর্থাৎ এক জনে যিকির করবে যেমন বলবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অতঃপর লোকজন তার অনুসরণ করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং অনুসরণকারীগণ এবং যার অনুসরণ করা হচ্ছে সকলেই উচ্চস্বরে যিকির করবে। আর এটা নির্ধারিত তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে মজলিস করে করা হবে। অতঃপর লোকজন জমায়েতের জন্য বলাবলিও করা হবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

(গ) যে ইমাম এমন মজলিসের আয়োজন করে থাকেন তার পিছনে নামায পড়ার বিধান কি? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

(ঘ) অনেক বক্তাকে দেখা যায়, তারা ওয়াজের মাঝে চা-পানি পান করার ক্ষেত্রে শ্রোতাদেরকে যিকিরে মশগুল রাখেন। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

উত্তর : (ক) কুরবানী দাতার জন্য মুস্তাহাব হল, যিলহজের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত নখ, চুল এবং শরীরের অবাঞ্ছিত পশম না কাটা। আর যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না সে উল্লিখিত আমল করলে কুরবানী করার সওয়াব পাওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ আমলটি করা তার জন্যও মুস্তাহাব। আর কুরবানী দাতা উল্লিখিত আমল করলে কবুল হজের সওয়াব পাওয়ার কথা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৭৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৭৮৯, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৪৩৬৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৫১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৮৮)

(খ) নফল যিকির-আযকারের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদেরকে শিখানোর উদ্দেশ্যে সীমিত কয়েক দিনের জন্য একজন যিকির করবে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্য সাধারণ লোকের যিকির করা জায়েয আছে। শিখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া এমনটি করা বিদ'আত। উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে উভয়ভাবেই যিকির করা যায়। কিন্তু উচ্চস্বরে যিকির করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, যিকির যেন লোক দেখানোর জন্য না হয়, কোন মুসল্লী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্টের কারণ না হয়। আর যদি উল্লিখিত কারণসমূহের কোন একটি পাওয়া যায় তাহলে উচ্চস্বরে যিকির করা এমনকি নিম্নস্বরে যিকির করাও নাজায়েয।

যিকিরের জন্য তারিখ, স্থান নির্ধারণ করা এবং সমবেত করার জন্য ই'লান করা জায়েয আছে। কিন্তু জরুরী মনে করলে জায়েয হবে না।

(গ) জায়েয পন্থায় যিকিরের মজলিস আয়োজনকারী ইমামের পিছনে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। আর নাজায়েয পন্থায় যিকিরের মজলিস আয়োজনকারী গুনাহগার এবং ফাসিক বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে তার পিছনে ইকতিদা করা মাকরূহে তাহরীমী হবে।

(ঘ) যদি বক্তা শুধুমাত্র চা বা পানি পান করার উদ্দেশ্যেই শ্রোতাদেরকে যিকিরে মশগুল রাখেন তাহলে সে গুনাহগার হবে; অন্যথায় হবে না। (সূরা বাকারা-১৫২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৫, ২৭০০, ফাতাওয়া শামী ১/৬৬০, সাবাহাতুল ফিকর ফিল জাহরি বিয্যিকর; পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর ১/১০৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৫-৩৬)

প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি ও সহীহ নিয়ত

হযরত মাওলানা আব্দুল হক আ'যমী রহ.

৩রা ডিসেম্বর ২০১২খ্রি. সোমবার সাইনবোর্ড জামি'আ আশরাফিয়া (মাদরাসা)-এর টিনশেড ভবনে 'বুখারী শরীফের দরস'-এ দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখে সানী হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল হক আ'যমী রহ. এর প্রদত্ত বয়ান। -সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ তা'আলার বড় ইহসান আর দয়া যে, তিনি আমাদেরকে দীনী ইদারার আহল হওয়ার তাওফীক নসীব করেছেন। এজন্য কালিমাতুশ শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ! এটা মাওলা পাকের বিরাট এক নিয়ামত। এর শোকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। যত বেশি শুকরিয়াই করি না কেন কমই হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য-অগণিত নিয়ামতের সামনে আমাদের সামান্য ও সীমিত কৃতজ্ঞতার ধারা জারি রাখার জন্য আল্লাহর তাওফীক চাই।

আজকের মজলিস আযীয তৃলাবা ও মুহতারাম উলামায়ে কেরামের মজলিস। এটা অত্যন্ত মুবারক মজলিস। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকেও কিছু মুবারক কথা বলার তাওফীক দেন যা সত্যিই আমাদের ইলম তলবের পথকে মুবারক করে তুলবে। আমীন!

ইলমের জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি ও নিয়ত দুরস্ত করে নেয়া। এ বিষয়ে কয়েকটা কথা মুযাকারা করব ইনশা-আল্লাহ।

ইলমের জন্য তাহারাত

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য অপরিহার্য হল তাহারাতে যাহেরী ও তাহারাতে বাতেনী অর্জন করা। তাহারাতে যাহেরী হল বাহ্যিক পবিত্রতা। অর্থাৎ সবসময় তাকওয়া-তাহারাতের সাথে থাকা। পবিত্রতার সাথে থাকা। আর তাহারাতে বাতেনী হচ্ছে আত্মিক পবিত্রতা। অর্থাৎ অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, ইত্যাদি রযায়েল-আত্মিক মন্দ স্বভাব থেকে কলবকে মুক্ত রাখা। ইলমের জন্য তাহারাতে বাতেনী এত জরুরী, যেমন নামাযের জন্য উযূ জরুরী। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায কবুল হয় না।' (সুনানে তিরমিযী ১/৩)

এমনিভাবে ইলমে ওহীর জন্যও অতীব জরুরী হচ্ছে তাহারাতে বাতেনী। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, 'নামায দুই প্রকার- (১) যাহেরী নামায। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এর জন্য যাহেরী তাহারাত উযূ হলেই চলে। (২) আরেক প্রকার নামায হল বাতেনী নামায। যার জন্য যাহেরী তাহারাতই যথেষ্ট নয় বরং তার তাহারাত হল বাতেনী নাজাসাত থেকে কলবকে পবিত্র রাখা। এই বাতেনী নামাযের নাম হল 'ইলমে দীন'।

তাহারাতে যাহেরী

ইমাম বুখারী রহ. এর কথাই বলি, তিনি সর্বদা উযূ সহকারে থাকতেন। প্রত্যেকটা হাদীস লিখতে গিয়ে তিনি উযূ-গোসল সেরে তারপর লিখতেন। সহীহ বুখারীর কোন হাদীসই তিনি উযূ ছাড়া সংকলন করেননি। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. তার এক ছাত্রবন্ধুর সাথে চুক্তিই করে নিয়েছিলেন যে, কোন একটা হাদীসও উযূ ছাড়া ধরব না এবং সবকে কোন একটা হাদীস ছুটতেও দিব না। সুতরাং দরসে বসার পর কারো উযূ ছুটে গেলে সে চলে যাবে, আর অন্যজন বিভিন্ন জরুরী প্রশ্ন করে উস্তাদকে প্রসঙ্গ কথায় লিপ্ত রাখবে। ইত্যবসরে অপর সাথী উযূ করে চলে আসবে। ছাত্র-উস্তাদ সকলেই খেয়াল করি, আকাবিরদের মাঝে পবিত্রতার সাথে ইলম তলবের কী জযবা ছিল, কিরূপ ইহতিমাম ছিল। আমরাও আমাদের মাঝে উক্ত অভ্যাস গড়ে তুলি। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন!

যাকারিয়া রহ.এর আব্বা হযরত ইয়াহইয়া রহ. একবার হিদায়া দরস দিচ্ছিলেন। এক তালিবুল ইলম প্রশ্ন করে বসল যে, হযরত! এখানে আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. কী বোঝাতে চেয়েছেন? ঘটনাক্রমে প্রশ্নটি করা হল এমন স্থানে যা একেবারে স্পষ্ট। তবুও যখন প্রশ্ন করা হল উস্তাদে মুহতারামের বুঝতে বাকি রইল না। তাই মযাক করে বললেন, শোন ভাই! তোমার ইবনুল হুমাম আসতে কতক্ষণ লাগবে? কই এসেছে নাকি? চল সামনে। সবক পড়। এভাবে উস্তাদগণও সুযোগ করে দিতেন। তারপর সবক সামনে আগাতেন।

তাহারাতে বাতেনী

বাতেনী নামায-ইলম নসীব হওয়ার জন্য তাহারাতে বাতেনী অন্যতম শর্ত। যেমনিভাবে যাহেরী নামাযের জন্য তাহারাত-উযূ শর্ত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে এবং অন্তরে অহংকার পোষণ করে সে কখনো ইলম অর্জন করতে পারে না। (সহীহ বুখারী ১/২৪)

অর্থাৎ তাকাব্বুর, হিংসা, বিদ্বেষ, অযথা লোভ এমন এক নাপাকী যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকলে তাকে ইলমে দীন থেকে মাহরুমীর মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। ইমাম গাযালী রহ. বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলেন, এই বদস্বভাবগুলো তো কুকুরের মত। হাদীসে পাকের ইরশাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে ঘরে কুকুর থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না এবং ঐ ঘরেও রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে প্রাণীর ছবি-ফটো থাকে। (সহীহ বুখারী-২/৮৮০)

অর্থাৎ ফলাফল এই দাঁড়ায়; যে অন্তরে অহংকার নামক কুকুর থাকে সে অন্তরে ইলম প্রবেশ করতে পারে না। কারণ ইলম হল 'মাদ্দায়ে ফাইয়্যায' তথা ফয়েযের উৎসমূল। যা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ফেরেশতার মাধ্যমে বান্দার অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। সুতরাং যে অন্তরে এ সমস্ত রযায়েল-বদস্বভাব বিদ্যমান থাকবে সে অন্তরে কেমন যেন কুকুর বিদ্যমান। আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কুকুর থাকায় সে কলবে ইলম বহনকারী রহমতের ফেরেশতা ঢুকতে পারে না। ফলে সে ইলমে দীন থেকে মাহরুম হয়ে যায়। (আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন) এটা আমাদের কারো কাম্য হতে পারে না। আমরা কেউ এটা চাই না। অতএব ইলম অর্জন করতে হলে আগে নিজের ভিতরের কুকুর সদৃশ নাপাকীগুলো ঝেড়ে ফেলে অন্তরকে পাক-সাফ করতে হবে।

অন্তরকে পাক সাফ করার তরীকা

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর মুহতারাম আব্বা শাহ আব্দুর রহীম রহ. একদা উযূ করে

নামাযের উদ্দেশ্যে একটি সরু পথ ধরে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাচ্ছিলেন। যে পথে যাচ্ছিলেন সে পথের দু'ধারে নাপাক পানি ছিল। এমন নাপাক পানি যা কাপড়ে লাগলে নাপাক হয়ে যায়। খুব সতর্ক হয়ে হাঁটছিলেন। ইতোমধ্যে সামনের দিক থেকে আসছিল একটি কুকুর। কুকুরটি সামনাসামনি হলে তিনি কুকুরটিকে লক্ষ্য করে বললেন, এই কুকুর সরে যা, নামায পড়তে যেতে হবে। আমি নাপাকী ঘেঁষে চললে কাপড় নষ্ট হবার সমূহ আশঙ্কা আছে। ফলে কাপড় ধৌত করতে পুনরায় বাসায় ফিরতে হবে। আর এদিক দিয়ে জামা'আত ছুটে যাবে। অতএব সাইড দাও; আমি যাই। আল্লাহ পাক তো 'কাদেরে মুতলাক' তথা যখন খুশি যে কারো যবান খুলে দিতে পারেন। কুকুরের যবান খুলে দিলেন। সে তাকে বলতে লাগলো, শাহ সাহেব! আপনি যে নাপাকির কথা বলছেন এটা তো দুনিয়ার পানি দিয়ে দূর করা সম্ভব। কিন্তু আপনার ভিতরে যে নাপাকী রয়েছে তা তো আমার চেয়েও হাকীর ও যলীল (তুচ্ছ ও খারাপ)। সেটাকে কুকুর নয় বরং এর চেয়েও বড় ধরনের নাপাকী বলা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে কিবর (অহংকার)। যেটা দুনিয়ার পানি দিয়ে ধুয়ে দূর করা বা পবিত্র করা যায় না। সে ব্যাপারে খেয়াল রেখেছেন কি? কুকুরের মুখে এই মর্মবাণী শুনে শাহ সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। কুকুরটা তো বড় আশ্চর্যের কথা বলল? ভেবে ভেবে চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন। তখনই অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, আব্দুর রহীম! এই কুকুরটি ছোট থাকতে এক শীতের রাত্রে শীতের কষ্টে চিৎকার করছিল। তা দেখে তোমার মায়া হয়েছিল। তুমি তোমার নিজের শরীরের চাদর খুলে তার শরীরে জড়িয়ে দিয়েছিলে। তাই আমার ইচ্ছা হয়েছে এই ইহসানের বদলা তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। তাই এর মাধ্যমে এই উপদেশ প্রদান করত তা পূর্ণ করলাম।

এ ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, এ ধরনের নাপাকী দুনিয়ার পানি দিয়ে পবিত্র করা যায় না। তাহলে কীসের দ্বারা এগুলো দূর করা যায়? আমাদের জানতে হবে এগুলো থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় কি? জ্বী হাঁ, এ ধরনের নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় হল, হিম্মত করা। হিম্মত করলেই হয়। হিম্মত মানে সুদৃঢ় শপথ করা। ইলম পিপাসুর ইলম শিখার শুরু থেকেই এই মর্মে দৃঢ় শপথ করা যে, আমি অহংকার করব না। যত বড় বিপদই আসুক লোভ-লালসায় জড়াব না ইত্যাদি মর্মে দৃঢ় ইচ্ছা থাকতে হবে। আকাবিরদের বাণী আছে, হিম্মতে বান্দা, মদদে খোদা। অর্থাৎ বান্দার কাজ হল হিম্মত করা আর মদদ করা হল খোদার কাজ। সুতরাং হিম্মত করে সম্মুখপানে অগ্রসর তো হতে হবে। তাহলেই খোদা তা'আলার মদদ-সাহায্য শামিলে হাল হওয়ার আশা করা যায় ইনশা-আল্লাহ।

ইলমের জন্য নিয়্যত অপরিহার্য

তাহারাতের পর তালিবে ইলমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নিয়্যতের দরজা। নিয়্যত ছাড়া কোন ইবাদত সহীহ হয় না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদতের জন্যই নিয়্যত অপরিহার্য। এগুলো হচ্ছে ইসলামের ইবাদাতে আসলী-মৌলিক ইবাদাত। এগুলোর মধ্যেই যদি নিয়্যত শর্ত হয় তাহলে তো অন্যান্য শাখাগত বিষয়াদীতে আরো আগেই নিয়্যত শর্ত হবে যা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইলম শিখার জন্যও নিয়্যত দুরস্ত করে নেয়া আবশ্যক। এজন্য ইমাম বুখারী রহ. নিয়্যত সংক্রান্ত হাদীস– প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল– এনে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হে প্রিয় বৎস! আগে নিয়্যত দুরস্ত করে নাও। এতে তোমার বাহ্যিক নামায তো সহীহ হবেই, সাথে সাথে তোমার বাতেনী নামায তথা ইলম শিক্ষাও সহীহ তরীকায় হয়ে যাবে।

নিয়্যতের স্তর

সুতরাং নিয়্যত কেমন হওয়া চাই? আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এর সুবিদিত গ্রন্থ আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর কিতাবের ৩৮৮নং পৃষ্ঠায় আছে যে, নিয়্যতের স্তর ৪টি-

১ম স্তর : যা শিখব শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাজি আর খুশি করার জন্যই শিখব। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। ইমাম বুখারী রহ. উপরোক্ত নিয়্যত সংক্রান্ত হাদীস এনে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, হে প্রিয়! নিয়্যত দুরস্ত করে নাও। ১০/১২ বছর ধরে কেন লেখা-পড়া করছ? যদি 'আল্লাহ তা'আলাকে রাজি আর খুশি করার জন্যই' হয় তাহলে তো মা-শা-আল্লাহ! তুমি কামিয়াব। অন্যথায় বলব, বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার খিদমত করো, যা তোমার উভয় জাহানে কাজে আসবে। এভাবে সময় নষ্ট করার কোন দরকার নেই। বর্তমানে ছাত্রদেরকে দেখা যায়, ১০/১২ বছর পড়া-লেখা করে ঠিক, কিন্তু ফারেগ হয়ে এমন এমন খেয়াল পেশ করে যা নিতান্তই আফসোসের। বলে, আমার ১০/১২ বছর পুরাই বেকার গেল ইত্যাদি নানান রকম কথা। শুনে বড়ই আশ্চর্য হতে হয়। নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর নিয়ামতের না-শুকরী। যাকে কুরআন ও হাদীসের ইলম তথা ইলমে অহী দেয়া হয়, আর সে তা সম্পূর্ণ বেকার মনে করে তার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে, 'তার চেয়ে বড় নিমক হারাম–না-শুকর ও অকৃতজ্ঞ বান্দা আর কেউ হতে পারে না'। (সহীহ বুখারী-১/১৮)

আসলে এত বড় নিয়ামতের উপযুক্ত আমরা ছিলাম না। আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে অনুগ্রহ করে তা দিয়েছেন। তাই এ জন্য বেশি বেশি শুকরগোযার হওয়া। নাশোকর হব না। না শুকরীর পরিণাম আমাদের জন্য মাহরূমীর কারণ হতে পারে। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করেন। আমীন!

আমার শাইখ হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. যখন দাওরা ফারেগ হয়ে বাড়িতে ফিরলেন, পাড়ার এক ভদ্র লোক তার পিতা মুহতারাম হাবীবুল্লাহ সাহেবকে বলল, আপনার ছেলেকে হুযূর বানিয়েছেন? সে তো সরকারী বা বড় কোন চাকরি-বাকরি পাবে না? সে চলবে কী করে? খাবে কী করে? এর চেয়ে ভালো হত তাকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানাতেন? মোটা অংকের মুনাফা কামিয়ে আড়ম্বর–সুখের যিন্দেগী গুযরান করতে পারত? একথায় তার প্রচণ্ড রাগ উঠল। রাগে চেহারা লাল টকটকে হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আচ্ছা ঘোড়া উত্তম না গাধা উত্তম? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে ঘোড়া উত্তম। হাবীবুল্লাহ রহ. বললেন, আমার ছেলেকে আমি ঘোড়ার উপর সওয়ার করিয়েছি। আর আপনি বলছেন গাধার কথা! শুনে রাখুন, যেমনিভাবে উন্নতমানের বাহন থেকে নামিয়ে নিম্নতর বাহনে সওয়ার করানো নির্বুদ্ধিতার কাজ, তেমনিভাবে ইলমে দীন (এর পরিবর্তে অন্য কোন জ্ঞান ইলম নয় বিধায় তা) বাদ দিয়ে অন্য ইলম শিক্ষা দেয়াও নির্বুদ্ধিতার কাজ; গাধার উপর সওয়ার করানোর নামান্তর। অতএব সে যে ইলম শিখেছে তার উপরই মেহনত করতে দাও। এটাই আসল। এটাই তার জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে শান্তি আর কামিয়াবীর পথ খুলে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দার মান রেখেছেন। ছেলেকে দিয়েছেন

দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। বিশ্বব্যাপী সমাদৃত করেছেন আকাবিরে দেওবন্দ হিসেবে। শাইখুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী নামে। অবশেষে লোকটি তার অল্প কথায় সদুত্তর খুঁজে পেয়ে উৎফুল্ল হলেন এবং দীনের সমঝ গ্রহণ করলেন। সুতরাং তালিবে ইলম ভাইদের বলছি, তোমরাও যে ইলম শিখছো তার উপরই একাগ্রচিত্তে মেহনত করে যাও। নিয়্যত খালেস করে নাও। তাহলে দেখবে, এটাই তোমাদের বড় কাজে আসবে।

২য় স্তর : সর্বদা আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করব। কেননা ইলম বলে, আমাকে শিখে আমল করো। যদি তা না পারো তাহলে আমার কাছ থেকে সরে যাও, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ শুধু জানার নাম ইলম নয়। জানা এবং মানা এ দু'য়ের সমষ্টির নামই হল ইলম। তাই জানার সাথে আমলেরও অভ্যাস গড়া চাই। আমলের তরীকা তা-ই যা আকাবিরদের বর্ণনায় আছে। অর্থাৎ ইলম–হাদীস মুখস্থ রাখার ইচ্ছা থাকলে যা পড় সেই মোতাবেক আমল শুরু করে দাও। ইলম অনুযায়ী আমলেও তা বাস্তবায়নের অন্যতম উপায় হচ্ছে; অল্প কিছু করে হলেও হাদীস মুখস্থ করে নেয়া। এর দ্বারা পঠিত বিষয়গুলোর প্রতি আমলের জন্য বেশ সাহায্য লাভ হয়। নতুবা তা আমলে আসে না। সুতরাং হাদীস মুখস্থ করণের বিকল্প হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার কোনো রোগ-বালাই ব্যতীতই শিঙ্গা লাগালেন। হাজামকে পারিশ্রমিকও দিলেন। উদ্দেশ্য কী? জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং হাজামকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তাই এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নাতের উপর আমল করাই আমার মূল উদ্দেশ্য; অন্য কিছু নয়। আল্লাহু আকবার! মাযহাব চতুষ্টয়ের একটির ইমাম হযরত আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর মত ব্যক্তি শুধু সুন্নাতের উপর আমলের উদ্দেশ্যেই শিঙ্গা লাগালেন, পারিশ্রমিক গুনলেন। এর দ্বারা তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য কী বার্তা দিয়ে গেলেন? ইলম অনুযায়ী আমলেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করলেন নিঃসন্দেহে। বুঝা গেল একবার হলেও তার উপর আমল করতে হবে তাহলেই তা রপ্ত করতে বেগ পেতে হবে না।

৩য় স্তর : যা শিখব তার প্রচার-প্রসার করব এবং যারা শিখতে চায় তাদের কাছে পৌঁছে দিব– এই মর্মে নিয়ত থাকতে হবে। এমনকি ঐসকল লোকদের কাছেও পৌঁছানোর ফিকির থাকতে হবে যাদের নিকট কখনো এর দাওয়াতটুকুও পৌঁছেনি। এটাকে নিছক কোনো কাজ হিসেবে নয় বরং নিজের যিম্মাদারী মনে করে করতে হবে এবং সেই মোতাবেক তা পালনে ব্রতী হবে।

৪র্থ স্তর : যা শিখছি এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর তার (লেখকের) আলোচনা অব্যাহত থাকবে– এই নিয়ত রাখবে। অর্থাৎ যা শিখবে তা লিখে রাখবে। কেননা এর দ্বারা ইলম ও লেখা যিন্দা থাকে এবং মৃত্যুর পর অমরকীর্তি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। ইমাম বুখারী রহ. এর কথাই বলি। তিনি যদি বুখারী শরীফ লিখে না যেতেন, আজ যদি বুখারী শরীফ আমরা না পেতাম, না দেখতাম তাহলে বুখারী শরীফ কাকে বলে জানতাম? কে ইমাম বুখারী, চিনতাম? পৃথিবীর কেউ তাকে চিনতো? জানতো? না, কেউ তাকে চিনত না; জানত না। আজকে যে ইমাম বুখারী রহ. কে আমরা চিনি-জানি তার এই অমর গ্রন্থই এর একমাত্র মাধ্যম। এই কিতাবের কারণেই আজ জেনেছি ইমাম বুখারী হলেন অমুক তথা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী রহ.। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লেখা চাই। আমি বিভিন্ন দরসে বিশেষ করে হাদীসের দরসগুলোতে বলে দিই; যে কোনো কিতাব থেকে নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বলিত কমপক্ষে ৪০টি করে হাদীস যেন সবাই জমা করে। সংকলন করে রাখে। এতে অনেক সওয়াব হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফায়দার দিকে খেয়াল করে ৪০টি হাদীস শুনাবে এবং হিফয তথা মুখস্থ করবে, লিখে রাখবে অথবা প্রচার-প্রসার করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে আলেম ও শহীদদের কাতারে উঠাবেন এবং বলবেন; আট দরজার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ করো। (জামে সগীর, সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া)

সুবহানাল্লাহ! কত বড় আজীমুশ্বান ফযীলতের বিষয়। এটা যারা অর্জন করতে চায় তারা অবশ্যই এর উপর আমল করবে। এজন্য তোমাদেরও বলি, ভাই! তোমরাও লেখো। ৪০ হাদীস লেখো। উম্মতের তরে এতটুকু খেদমত করো। দেখো, যারা আমাদের আকাবির বনেছেন তাদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনো বিষয়ে ৪০ হাদীস লেখার জন্য কলম ধরে গেছেন। ৪০ হাদীস সংকলন করে গেছেন। তাদের অনুসরণে আমাদেরও লেখা উচিত। আল্লাহ আমাদেরও তাওফীক দিন। আমীন!

পরিশেষে বলতে চাই, এই কওমী মাদরাসাগুলোর সিলসিলা গোড়াপত্তন হয়েছিল স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতী হাতেই। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তারই ইশারায় কাসেম নানুতবী রহ. এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উক্ত কওমী মাদরাসাগুলোর মূল কেন্দ্রবিন্দু, প্রাণের স্পন্দন দারুল উলূম দেওবন্দ। আজ যা শুধু ভারত উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বেই হক ও হক্কানিয়াতের দীপ্ত মশাল জ্বালাতে সক্ষম হচ্ছে। এই মাদরাসাগুলো থেকেই আবারো তৈরী হবে আকাবিরে দেওবন্দের ন্যায় লাখো লাখো বিপ্লবী সেনা। যারা ছিনিয়ে আনবে ইসলাম ও মুসলমানদের হারানো অতীত। তাদের রক্তে লেখা হবে আগামীর গৌরবমাখা ইতিহাস। কিন্তু কখন এগুলো হবে? সহীহ তরীকায় ইলম শিখে তার উপর আমল না করলে? কখনোও না। আফসোস হয় অনেক ছাত্রের হীনমন্যতা দেখে! কেন যে তারা হীনমন্যতায় ভোগে? আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই লাইনকে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিয়ে যাননি? যদি দিয়ে থাকেন তাহলে হীনমন্যতা কেন? আকাবিরে দীনেরা এই ইলম শিখেছেন এবং এর সাথে লেগে থেকেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল প্রয়োজন পুরা করে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা-

চেতনাকে আখেরাতমুখী করে নেয় আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (ই'লাউস সুনান ২০/৯৪০৮)। সুবহানাল্লাহ!

অতএব আযীয তুলাবারা! কথায় আছে- লাগি থাকলে ভাগি হওয়া যায়। তাই তোমরাও এই ইলম শেখো এবং এর সাথে লেগে থাকো। একমুখী হয়ে মেহনত করে যাও। দেখবে, তোমাদের প্রয়োজনও আল্লাহ তা'আলা তার গায়েবী খাযানা থেকে পুরা করার ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ! ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযিয।

হাদীসের সনদ

আমাদেরকে বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন আমাদের শাইখ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। তার শাইখ শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী। তার শাইখ কাসেম নানুতবী রহ. ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.। তাদের উভয়ের শাইখ শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলবী রহ.। তার শাইখ শাহ ইসহাক দেহলবী রহ.। তার শাইখ তার নানা আব্দুল আযীয দেহলবী রহ.। তার শাইখ তার পিতা মুসনাদুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.।

মাওলানা আব্দুল হক আ'যমী রহ. : সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ : আব্দুল হক ইবনে মুহাম্মদ উমর হানাফী আ'যমী দেওবন্দী রহ.।

জন্ম : ১৩৪৫ হিজরীর রজব মাসে সোমবার দিন ভারতের উত্তর প্রদেশ আ'যমগড়ের জগদীশপুরে তার জন্ম। ছয় বছর বয়সেই পিতাকে হারিয়ে এতীম হন। তারপর শাইখ আবুল হাসান মুহাম্মদ মুসলিমের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

শিক্ষা জীবন : তিনি শরহেবেকায়া পর্যন্ত সারায় মীরের বাইতুল উলূম মাদরাসায় লেখা-পড়া করেন। আরবী ভাষা, নাহব-সরফ, এবং মুখতাসার কিতাবগুলোও এখান থেকেই সমাপ্ত করেন। এরপর দারুল উলূম বিজনূরে হিদায়া জামাআতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মিশকাত পর্যন্ত পড়েন। পাশাপাশি আরবী সাহিত্য, উসূলে ফিকহসহ আরো অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি দাওরায়ে হাদীসসহ উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

হাদীসের কোন কিতাব কার কাছে পড়েছেন : সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযীর প্রথম অর্ধেকাংশ পড়েন হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. নিকট, সহীহ মুসলিম ইবরাহীম বালিয়াভী রহ., সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে তিরমিযীর দ্বিতীয় অর্ধেকাংশ এবং শামাইলে তিরমিযী শাইখুল আদব ইযায আলী আমরূহী দেওবন্দী রহ., সুনানে নাসায়ী, মুয়াত্তা মালেক, ত্বহাবী ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ., সুনানে ইবনে মাজাহ যহুর হাসান দেওবন্দী রহ., মুয়াত্তা মুহাম্মাদ জলীল আহমদ রহ. প্রমুখের নিকট। ফারেগ হন ১৩৬৮ হিজরী সনে। এছাড়াও তিনি আল্লামা মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আ'যমী রহ., শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ., মুহাদ্দিস ফখরুল হাসান রহ., আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ., ক্বারী তৈয়্যব কাসেমী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ থেকেও হাদীসের ইজাযত লাভ করেন।

কর্ম জীবন : তার শিক্ষকতা জীবনের সিংহভাগ কাটে দারুল উলূম দেওবন্দে। তার আগে বানারসের দারুল উলূম মাউ-তে ১৬ বছর শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার ঐক্যমতে তাকে শাইখুল হাদীস পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ইফতা বিভাগে আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও তাকে দেয়া হয়। সেই থেকে ইন্তিকাল অবধি তিনিই শাইখে সানী হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর পাশাপাশি ইফতা বিভাগের খণ্ডকালীন যিম্মাদারীও পালন করেছিলেন।

কতিপয় গুণাবলী : তিনি দেওবন্দের সবার মুরব্বী ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়া ছিলেন। সব সময় আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিতেন না। দাড়ি পাকা মুরুব্বী দেখা গেলেও যখনই দরসে বসতেন মনে হত তিনি ২০/৩০ বছরের তাগড়া যুবক। মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী দা.বা. বলেন, আমরা তার ইলমী যামানায় কখনো রাত দু'টোর আগে তাকে ঘুমাতে দেখিনি। পারিবারিক জীবন যাপনে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধা প্রকৃতির। কোনরূপ বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। উস্তাযে মুহতারাম হাফেয মাওলানা কামালুদ্দীন সাহেব দা.বা. দেওবন্দে পড়াকালীন তার খাদেম ছিলেন। তিনি শুনিয়েছেন, হুযূর বাংলাদেশের কোন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের নাম শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন তাদের বিভিন্ন সিফাতের কথা। একবার আমাদের শাইখ মুফতী আব্দুল বারী সাহেব দা.বা. (প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম জামিয়া আশরাফিয়া, খলীফা হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.) এর আলোচনা উঠলে তিনি বললেন, 'ও সাহিবে নিসবত আদমী হ্যায়।' তিনি বাংলাদেশী ছাত্রদেরকে নানা-দাদার মত আদর-স্নেহ করতেন। তার বিয়োগে বিশেষ করে বাংলাদেশী ছাত্ররা নানা-দাদার আদর পাওয়ার আপন লোকটিকে হারাল। হারাল বিপদের একান্ত সহযোগী বন্ধুকে। কারণ বাংলাদেশী ছাত্ররা দেওবন্দে ভর্তি সংক্রান্ত কোন জটিলতায় পড়লে সেই চরম মুহূর্তে পাশে দাঁড়াতেন এই আব্দুল হক আ'যমী হুযূর রহ.। তিনি এসব কিছুর পরও ছিলেন অনন্য অসাধারণ ব্যক্তি। অসাধারণ কেন বললাম? কারণ তিনি অসাধারণ উঁচু মাপের লোক হয়েও যে কোনো সাধারণ বিষয়ে নিজেকে জড়াতে পারতেন অবলীলায়। যা রীতিমত অবাক করারই বিষয়। আকাবিররা এভাবেই নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতেন বিভিন্ন সাধারণ বিষয়ের পর্দার আবরণে। আর এজন্যই কবি বলেছিলেন, 'উলা-ইকা আবা-ই ফাজি'নী বিমিসলিহিম' অর্থাৎ 'এরাই মোদের পূর্বসূরী, মিলবে কোথায় তাদের জুড়ি'। আল্লাহ আমাদেরকেও তাদের মত হওয়ার তাওফীক দিন।

মৃত্যু : ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী বা'দ মাগরিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন বা'দ যোহর জানাযা শেষে দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীতে শাইখুল হিন্দের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

অনুবাদক : আল আমীন বিন সাবের আলী
শিক্ষক, জামি'আতুল আবরার (কাঁচপুর মাদরাসা) সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

সো জা সা প্টা

হিজাবের নামে...

আবূ তোরাব মা'সূম

ঘোমটা...

আজব বগি! মনে পড়লে এখনো গা ছমছম করে ওঠে। বোঝা আর মানুষে ঠাসা। পা ফেলবার জায়গা নেই। এমনকি সিটের নিচেও দুই-তিন জন দিব্যি নাক ডেকে চলেছে। আমার উপরের স্লিপারে চারপাঁচজন গাদাগাদি করে ঘুমাচ্ছিলো। হোলফা গোষ্ঠির এক বুড়ো কোথাও জায়গা না পেয়ে সেই গাদাগাদির স্লিপারে উঠে গেলো। এই গোষ্ঠীর হিন্দুদেরকে অন্যান্য সাধারণ হিন্দুরাও চরম অপছন্দ করে। এরা নোংরা, জঘন্য ও উগ্র কিসিমের। বুড়ো স্লিপারে ওঠার পর উপরে কী ঘটছে নীচ থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। শুধু কিছু বিতণ্ডার শব্দ, তারপর লাথির মতো কিছু একটা শোনা গেলো– ধড়াম!! মই বেয়ে ওঠা বুড়ো মই ছাড়াই পতিত হলো। সিটের একেবারে কোণে বেজায় মোটা এক বুড়ি কোনমতে বসেছে। বুড়ো কারো সাথে না পেরে বুড়িকে টার্গেট করলো। বুড়িও বিষয়টি ধরতে পেরে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সিট কামড়ে বসলো। কিন্তু শেষমেষ আর কুলিয়ে উঠতে পারলো না। দীর্ঘ শীতল লড়াইয়ের পর নাছোড় বুড়োর জন্য অসহায় বুড়ির জায়গা ছাড়তেই হলো। যা হোক, এসব বিবরণ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি– জায়গা দখলের লড়াই যখন চলছিলো তখন বুড়োর সাথে চোখাচোখি হলেই বুড়ি লজ্জা পাচ্ছিলো। তাই সে একহাত দিয়ে বারবার ঘোমটা টেনে নিচ্ছিল। একে তো বুড়ি, তার উপর হিন্দু! ঘোমটা টানাটা কেমন কেমন ঠেকে না? সবার কাছে অন্যরকম ঠেকলেও আমি কিন্তু এতে মোটেও অবাক হইনি। কারণ ঘোমটা টানা নারীর প্রকৃতি। নারীর লাজুক সত্তায় এটা মেশানো। এখানে হিন্দু, বুড়ি এমনকি প্রাণীরও পার্থক্য নেই। প্রাণীর মধ্যে যারা নারী তারাও ঘোমটা টানে– অনুভবের দৃষ্টিতে দেখলেই বুঝবেন। মজ্জায় লজ্জা মেশানো এই নারীকে যারা নির্লজ্জ করার যুদ্ধে নেমেছে, তারা মূলত প্রকৃতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নেমেছে। নারী বোরকা পরুক-না পরুক; ঘোমটা টানবেই। ইসলাম এই ঘোমটাকেই একটু বেশি করে টেনে পা পর্যন্ত এনে আপাদমস্তক করে দিয়েছে। এই আপাদমস্তক ঘোমটাই ইসলামের সংবিধান। অলঙ্ঘনীয় পর্দাবিধান। আজ দেশে-বিদেশে এই বিধান খুব লঙ্ঘন হচ্ছে। অথবা লঙ্ঘন না হলেও এই বিধানের প্রতি আতঙ্কজনক শিথিল মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই তো বগিতে আমার সামনেই কয়েকজন বোরকাবৃত মহিলা বসা ছিলো। ক্লান্তিতে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশের লাইন দিয়ে চোখের পলকে আরেকটি ট্রেন অতিক্রম করলো। ট্রেনের গর্জনে তন্দ্রা উবে যেতেই দেখি, নারী আছে, বোরকা নেই। খুবই অবাক হলাম। গরমে হয়তো খুলে ফেলেছে। কিন্তু এ কেমন পর্দা! সামান্য গরম হলেই যা খুলে ফেলতে হয়!! যাক, ইন্ডিয়ার বিষয়টা না হয় ভিন্ন। কারণ ইন্ডিয়া অনেক বড় বহুজাতিক একটি দেশ। এখানে নানা জাতধর্ম একাকার হওয়ার কারণে ধর্মীয় শরম-লজ্জা অনেকটা উঠে গেছে এবং এখনো এই দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক কর্ম সারে। এমন সমাজতন্ত্রে বেড়ে ওঠা নারীদের জন্য যত্রতত্র বোরকা খুলে ফেলায় বোধহয় খুব একটা আশ্চর্য হওয়া বোকামি। কিন্তু আমাদের দেশে পর্দা নিয়ে যে উদাসীনতা বা উদাম হওয়ার মানসিকতা অথবা দেহ ফুটিয়ে তোলার ঘৃণ্য প্রবণতা– তার কী ব্যাখ্যা দিবেন আপনি? আমাদের দেশ মুসলিম প্রধান ছোট্ট একটি দেশ। এখানে সবাই জানে। সবার কানেই দীন পৌঁছে। এবং এখানে পর্দা করলে কেউ 'দাঙ্গা'ও বাধায় না, 'বাকরা'ও বানায় না। ধর্ম জানার ও মানার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আনুকূল্যের দেশ এটি। এমন অনুকূল পরিবেশেও পর্দা নিয়ে যাদের উদাসীনতা আছে বা ফ্যাশন ও প্রগতিশীলতার মনোভাব আছে আমি মনে করি তারা মূলত ওয়ার্ল্ড নং ওয়ান ত্যাড়া।

অবাক তরুণী...

অন্ধকার চিরে ট্রেন ছুটছে। কাকে কে মাড়াচ্ছে, কার গায়ে কে পা তুলে দিচ্ছে, এ নিয়ে কারো কোন অনুযোগ নেই। ঠাসাঠাসি, ভ্যাপসা গরম, আর বহুজাতিক শ্বাস-প্রশ্বাসের উৎকট দুর্গন্ধে বগিটা গুমোট ও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পাইনি। প্রকৃতির কোলে একটু একটু চোখ খুলছে এমন একটি নান্দনিক ভোরে আমারও চোখ খুললো। ট্রেন মন্থর হচ্ছে। কোন স্টেশন দেখার জন্য সাথীদের একজন জানালা দিয়ে মাথা বের করেই চেঁচিয়ে উঠলো– 'এ..ই জয়পুর আইসা পরছে।' দীর্ঘ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। তারপর খোলা পৃথিবীতে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা করে প্রাণভরে হাই তুললাম। চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনটা ভরে গেলো! কী ঝকঝকে ও মনোরম একটি শহর!

৭০০ রুপি দিয়ে দিবসচুক্তি একটি মাহিন্দ্র ঠিক করা হলো। স্টার্ট চালুই ছিলো, আমরা কোনমতে চড়তেই দিলো ছুট।

বিশাল চওড়া রাস্তার পাশে ফুলের পাপড়ি বিছানো পরিপাটি ফুটপাথ ধরে কিছু তরুণী হেঁটে যাচ্ছে। পুরোটা চেহারা কালো নেকাবে আবৃত। এমনকি চোখও খোলা নেই। আমার মুগ্ধতা আছড়ে পড়লো। জয়পুর তো মুসলিমপ্রধান অঞ্চল নয়! তবু এখানের তরুণীরা এতো দারুণ পর্দা পালন করছে! মাশাআল্লাহ! আমাদের দেশের মেয়েদের এই তরুণীদের থেকে আদর্শ ও চেতনার সবক শেখা উচিত।

এই যখন ভাবছিলাম, আমাকে আবার চমকাতে হলো! প্রভু হে, ক্ষমা দাও! এতোক্ষণ নীচে দৃষ্টি পড়েনি। হাদীসে এসেছে, চোখ পড়ার সাথেসাথে ফিরিয়ে নাও। হাদীসের উপর আমল করে তরিৎ দৃষ্টি সরাতে হলো। কী বেহালদশা! মুখ তো মাশাআল্লাহ কালো নেকাবে আবৃত। কিন্তু নীচে টাইট শার্ট ও জিন্সের কল্যাণে সমস্ত চড়াই-উৎরাই ভেসে আছে। মেয়েরা অন্য যাই পরুক, জিন্স পরতে দেখলে আমি আঁৎকে উঠি। জিন্স পরা মেয়েদের কেন জানি অনেক বেশী খারাপ মনে হয়। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন এক ভীড়ে, ভাই

ইন্ডিয়ায় জিন্সের এমন অবাধ চর্চা কেন? সে বললো, 'আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, সোনিয়া গান্ধী তরুণীদের জিন্স পরিধানের উপদেশ দিয়েছেন। জিন্স টাইট ও মোটা হওয়ায় নাকি ধর্ষণ রোধে সহায়ক'। কী ভয়ানক কথাবার্তা! যাক কথা ভয়ানক হলেও জিন্সের একটা লেজেগোবরে সমাধান তো পাওয়া গেল। কিন্তু নেকাবের কী সমাধান! জিন্স আর শার্টের সাথে তো নেকাব-হিজাবকে কিছুতেই মেলাতে পারছি না। একসমুদ্র পানি খেয়ে অনেক্ষণ নলের নীচে মাথা ধরে রাখলাম। আহ, কী শান্তি!

মাহিন্দ্র আবার ছুটছে। খানিক এগিয়ে সাঁ করে বাঁক নিলো। এই রাস্তাটি একেবারে পাহাড় ঘেঁষা। পাহাড়ী ফুলগুলো যেনো হি হি করে হাসছে। একফাঁকে চট করে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, আচ্ছা ভাই! এখানে প্রায় তরুণীদের দেখলাম মুখ ঢাকা! এরা কি মুসলমান?

–না ভাই, এরা সবাই হিন্দু।

–তাহলে নেকাবে মুখ ঢেকে রাখার রহস্য কী?

–আপনি এতোক্ষণে টের পান নাই এখানে কী তীব্র গরম? গরমের তীব্রতা থেকে মুখের ত্বক বাঁচানোর জন্যই মূলত এই কৌশল। এভাবে ত্বকও সুরক্ষা পায়, ফ্যাশনও হয়ে যায়...

ড্রাইভার আরো কিছু বলার টানে ছিলো, থামিয়ে দিয়ে বললাম, ব্যাস, ব্যাস, আগে বোলনে কী যরুরত নেহিঁ! ম্যাঁয় সামঝা হি নেহিঁ, খু--ব সামঝা!

হিজাব ফ্যাশনের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু মাথায় তেমন ঢুকেনি। শৈশব থেকেই হিজাব বলতে শরয়ী পর্দাই বুঝতাম। অর্থাৎ হিজাব শুনলে ব্রেইনে এটাই ভেসে উঠতো যে, স্কার্ফের সাথে নেকাবও আছে এবং একটি ঢিলেঢালা কালো বোরকাও আছে। বোরকা ও নেকাব ছাড়া ওড়না বা স্কার্ফের কল্পনা তো হতো, কিন্তু হিজাবের কল্পনা মোটেও হতো না। আর ফ্যাশন বলতে টুকটাক রংচং বা সেলাইয়ে কুচিকুচি ডিজাইন এমনই ভাবতাম। হিজাব ফ্যাশনের অনুষঙ্গ যে এতো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে সেটার গভীর অনুভূতি এই জয়পুরেই প্রথম হয়েছিলো। এরপরে সময়ে সময়ে মনে বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছে। আর মস্তিষ্ক সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্ট করেছে।

হিজাবফ্যাশন নিয়ে মন ও মস্তিষ্কের একটি কথোপকথন...

মস্তিষ্ককে উদ্দেশ্য করে মন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দোস্ত! এই যে হিজাব; আমি জানি এটার উদ্দেশ্য হলো পরপুরুষ থেকে ফ্যাশন ও সজ্জা ঢেকে রাখা। এখন দেখছি, খোদ হিজাবের মধ্যেই ফ্যাশন! এমনটি কেনো হলো? এবং এ ফ্যাশনের পেছনে মূল মনস্তত্ত্ব কী?

মস্তিষ্ক : এতো বড় করে প্রশ্ন করা লাগে? দুই লাইন শুনেই বিলকুল বুঝে গেছি। শোন, বিশ্বব্যাপী নারীদেরকে উদোম করার ষড়যন্ত্র বহু আগ থেকেই চলছে। এর সবচে বড় টার্গেট মুসলিম নারীরা। এখন মুসলিম নারীদেরকে বললেই তো তারা উদোম হয়ে যাচ্ছে না। তাদের পরকালের ভয় আছে। ইজ্জত-আব্রুর যত্ন আছে। তাই তাদের সামনে ফ্যাশনের ফাঁদ পাতার প্রয়োজন হলো। কারণ ফ্যাশনের নামে সব কিছুই চলে। এমনকি ফ্যাশনের নামে উদোম হলেও সমস্যা নেই। আর ফ্যাশনের সাথে যদি কোন ইসলামিক শব্দ জুড়ে দেয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। এই মনস্তত্ত্ব থেকেই ফ্যাশনের সাথে হিজাব শব্দটি মিলে হিজাব-ফ্যাশনের উদ্ভব ঘটেছে। এটাই মূল লক্ষ্য। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাপার তো থাকেই। আরেকটি বিষয় হলো নগ্নতার চেয়ে অর্ধনগ্নতার মাঝেই বেশি সুড়িসুড়ি। এখানে কল্পনার বিস্তর খোরাক থাকে, ওখানে থাকে না।

মন : একটু শর্ট ও সহজ কর। মাথার উপর দিয়ে যায়।

মস্তিষ্ক : এরচে শর্ট কিভাবে করে মানুষ!

মন : বাদ দে। তার মানে হিজাবফ্যাশন যে একটি ফাঁদ এটা মডার্ন-ধার্মিক নারীরা বুঝতেই পারছে না?

মস্তিষ্ক : কেউ কেউ তো বুঝতে পেরেও হঠকারিতা করছে। আবার অনেকেই বুঝতে পারছে না। কারণ ফ্যাশন ও সাজগোজ নারীর দুর্বল পয়েন্ট। এই পয়েন্ট ধরে নারীকে কাৎ ও কুপোকাৎ করা অনেক সহজ। পাশাপাশি এই ফ্যাশনে শরয়ী পর্দা বা ড্রেসকোডে সমস্যা হবে না এই প্রতিশ্রুতিও তো ঠিক থাকছে।

মন : প্রতিশ্রুতি ঠিক থাকছে কোথায়? আমি তো দেখি, ফ্যাশনের নামে কখনো বোরকা আছে, কিন্তু নেকাব নেই। অথবা নেকাব-হেডস্কার্ফ দুটোই আছে, কিন্তু নিচে শার্ট আর জিন্স। আমার তো মনে হয়, কিছু দিন পর টু পিস বিকিনির সাথেও হিজাবের প্রচলন আরম্ভ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

মস্তিষ্ক : সহজ সমীকরণটা বুঝলি না। প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতা এক না। প্রতিশ্রুতির টোপ হলো পুকুর। সেই পুকুরে যখন মাগুর মাছ ভীড় করতে লাগলো, আই মিন হিজাবফ্যাশনে যখন নারীদের টেন্ডেন্সী বাড়তে লাগলো, তখন হিজাব ফ্যাশনে ধর্মীয় ড্রেসকোডের পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য ভিন্ন টোপ ফেলা হলো।

মন : কী সেই ভিন্ন টোপ। যার কারণে নারী নির্দ্বিধায় শরীয়তও অমান্য করছে, আবার কোন প্রতিবাদও হচ্ছে না?

মস্তিষ্ক : উত্তরটা সামান্য কঠিন। একটা পান মুখে দিয়ে নেই... হ্যা, শোন। এটা হলো 'ক্যাজুয়াল আউটফিটের' টোপ। প্রথমে ছিলো শুধু হিজাবফ্যাশন। তারপর যখন দেখা গেলো হিজাবফ্যাশন নিয়ে তেমন কোন আপত্তি নেই, তখন সাথে জুড়ে দেয়া হলো ক্যাজুয়াল আউটফিট শব্দ দু'টি। প্রতিটি মানুষই যেহেতু ফর্মাল পোশাকের চেয়ে ক্যাজুয়াল পোশাকে বেশি আরামবোধ করে, তাই তাদের ব্রেইন ওয়াশ করা হলো এই বলে, ধর্ম ফর্মাল পোশাকের দায় সৃষ্টি করে। যা জীবন ও কর্মের জন্য কমফোর্টেবল না। সময় বাঁচাতে ও সহজ জীবনের জন্য চাই ক্যাজুয়াল আউটফিট। আউটফিট মানে হলো বিভিন্ন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করা পোশাক। যেমন ফিশিং আউটফিট, উইডিং আউটফিট, আউটফিট ফর স্কুল, ইত্যাদি। তারা হিজাবকেও আউটফিটের ক্যাটাগরিতে ফেলে দিলো। ফলে এখন ক্যাজুয়াল আউটফিটের নামে অন্যান্য পোশাকের মতো হিজাবেও পৃথিবীর যাবতীয় ফ্যাশন ও মৌসুমি আয়োজন বৈধতা পেয়ে গেছে। এমনকি ক্যাজুয়াল আউটফিটের নামে সাইক্লিং, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলার উপযোগী হিজাবও এসে গেছে মার্কেটে।

মন : মানুষ কিন্তু এখন শুধু ফ্যাশনে তুষ্ট নয়। পার্থিব উপকারও তালাশ করে?

মস্তিষ্ক : হিজাব ফ্যাশনে ইহবাদি উপকারিতার মনস্তত্বও রাখা হয়েছে। অলস নারীদের বলা হচ্ছে, বাজারে নানা ডিজাইনের হিজাব আছে। যা পরলে পর্দা

ছাড়াও আছে আরো নানা উপকারী দিক। হিজাব বাইরের ধুলোবালি থেকে ত্বক ও চুলের সুরক্ষা দেয়। হিজাব পরলে চুল ঠিক করার ঝামেলা থাকে না। যে কোন পোশাকে সুন্দর করে হিজাব পরলে অল্পতেই জমকালো সাজ হয়ে যায়। ইত্যাদি নানান কথাবার্তা! এভাবে তারা আজ হিজাবকে তার মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে।

অবশেষে পর্দার মৃত্যু...

জয়পুরের সেই তরুণীদের দেখার পর চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জয়পুরের দরকার নেই, এখন এই দেশেই চারপাশে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারবেন, হিজাব-ফ্যাশনে পর্দার বিবেচনা পুরোই উঠে গেছে। এখন এটা হয়ে গেছে হেডস্কার্ফ বা ওড়না ফ্যাশন। এই হেডস্কার্ফ ফ্যাশন আগেও ছিলো। কিন্তু তারা হেডস্কার্ফকে হিজাব বা পর্দার সাথে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। হেডস্কার্ফ বা ওড়না ফ্যাশন আগে ছিলো ঘরে মাহরামের সামনে। এখন এটাকে তালগোল পাকিয়ে বাইরে নিয়ে এসেছে গাইরে মাহরামের সামনে। এই ফ্যাশনেবল হিজাব এখন আর মুসলমানিত্বের পরিচয় বহনের যোগ্যতা রাখে না। বরং এটা পুঁজিবাদী শিল্পে পরিণত হয়ে সব জাতীর ট্রেন্ড ও ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গেছে। এইতো কদিন আগেই আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছে, 'শাড়ি নয়, শর্ট ড্রেস নয়, নয় কোন অচেনা পোশাক– নতুন ফ্যাশন বস্ত্র হিসেবে উঠে এলো মুসলমান নারীদের পোশাক হিজাব। সৌজন্যে ইতালীয় ফ্যাশন হাউস ডোলকে এন্ড গাবানা'। অন্য একটি অনলাইন পোর্টালে লিখেছে, ধারণা করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী হিজাবের বাণিজ্য ২০২০ সাল নাগাদ ৩২ হাজার ৭শ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। হিজাবে যদি ফ্যাশনের অনুষঙ্গ মুখ্য না হয়ে থাকে, তাহলে এই বিশাল বাণিজ্য কিভাবে সম্ভব? মানুষ এতো বুযুর্গ হয়ে ওঠে নি যে, এমন বিপুল হারে পর্দার জন্য হিজাব কিনে বেড়াবে?

সাবধান!

হিজাব শব্দটির কারণে মুসলিম মেয়েরা এখনো ধোঁকা খাচ্ছে। এবং বিশ্বব্যাপী হিজাবের দাবানাল-বিস্তারে গর্ব করছে। ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলে কোন মেয়ে হিজাব পরে নিউজ পাঠ করেছে তা নিয়ে উৎফুল্ল হচ্ছে। বাণিজ্যিক ও ফ্যাশনেবল হিজাব নিয়ে আমাদের গর্বের কিছু নেই রে বোন! এই হিজাব এখন পর্ণ স্টাররাও পরে। স্বল্প পারিশ্রমিকের নিশিকন্যারা এই হিজাব পরেই আলো-আঁধারিতে নেশাগ্রস্ত পুরুষদের আহ্বান করে। সুতরাং আমরা হিজাব বা বোরকার মারপ্যাচে যেতে চাই না। আমরা চাই মুসলিম নারীরা নিজেদের আপাদমস্তক ঘোমটা টেনে আবৃত করে রাখুক। এবং বেগানা পুরুষের সামনে নিজের এইটুকুন সৌন্দর্যও প্রকাশ হতে না দিক। এটাই আমাদের হিজাব। এবং সহজ হিসাব। আরেকটি অনুরোধ, যে হিজাব ফ্যাশনমুক্ত নয় এবং যে হিজাবের সাথে বোরকা ও নেকাব নেই, সেটিকে দয়া করে ওড়না বা স্কার্ফ-ফ্যাশন বলতে শুরু করুন। আগেই বলেছি, পর্দা ছাড়া হিজাব আমাদের বুঝে আসে না।

গুগল সার্চ...

একটি ছোটখাটো সার্চ দিয়ে দেখে নেয়া যাক, ফ্যাশনের অনুষঙ্গ নিয়ে কী কী ধরনের ও নামের নয়নাভিরাম হিজাব বিশ্ববাজারে ওঠে।

লোডিং... লোডিং... লোডেড

১. লং অপেন কার্ডিগান ২. চেষ্ট কাভারেজ হিজাব ৩. ম্যাক্সি হিজাব ৪. জার্সি হিজাব ৫. গ্লিটার হিজাব ৬. জুয়েলড হিজাব ৭. সামার এন্ড উইন্টার হিজাব ৮. প্যাস্টেল ৯. আবায়া ১০. ইসাবেলা ১১. রাউন্ডফেইস হিজাব ১২. ক্যাপ হিজাব ১৩. অষ্ট সিঁড়ি ষষ্ঠ প্যাঁচ হিজাব ১৪. পাশমিনা হিজাব... লোডিং প্রোবলেম...

যে কটা হিজাবের নাম ও ধরন স্ক্রিনে এসেছে, এর বাইরেও আরো অনেক আছে। লোডিং আটকে যাওয়ায় আসছে না। যাই হোক হিজাব-ফ্যাশনের স্বরূপ বোঝার জন্য এই কটাই যথেষ্ট। যারা এই ১৪টি হিজাবের নামের অর্থ বুঝেছেন, তারা ইতোমধ্যেই ধরে ফেলেছেন যে, এই হিজাবগুলোতে মোটেও পর্দার বিবেচনা নেই। হিজাবফ্যাশন একটি শিরোনাম মাত্র। হিজাবফ্যাশনের নামে মূলত আপনার পুরো দেহের পোশাক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। অর্থাৎ হিজাবই এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে, হিজাবের সাথে ম্যাচিংয়ের জন্য বাধ্য হয়েই কখনো আপনাকে ম্যাক্সি পরতে হচ্ছে। কখনো পরতে হচ্ছে বুকখোলা কার্ডিগান, কখনো আবার আবায়া। জিন্স শার্ট পরাও বাকি থাকছে না আপনার। আজব ব্যাপারস্যাপার! মূলের খবর নেই, ম্যাচিং নিয়ে টানাহেঁচড়া। তাহলে হিজাব ফ্যাশন নাম না দিয়ে ম্যাচিং ফ্যাশন দিলে বেশি ভালো হতো না? ম্যাচিং করতে করতে অনেকসময় দেখা যায় হিজাব ফ্যাশনে হিজাব বা হেডস্কার্ফই থাকে না। সেটাও নাকি হিজাব ফ্যাশন!

প্রত্যাবর্তন...

দু'দিন পর। জয়পুর থেকে ফিরছি। সূর্য ঈষৎ হেলেছে। তাতে কী! গরমে ঠিকই মগজ টগবগ করছে। পাওয়ার বাটন চেপে টেম্পারেচারে চোখ বুলালাম। ফোরটি ফাইভ আপ! আমরা মনে হয় দেওবন্দ এসে গেছি। প্রাণের স্পন্দন দেওবন্দের গন্ধ নাক ছুঁতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ট্রেন ধীর হচ্ছে। পৃথিবীর এই একটাই স্টেশন, দেওবন্দ স্টেশন, এখানে এরাইভিংয়ের মতো আনন্দ আমার আর কোথাও হয় না। এখানে যতোবার ট্রেন ধীর হয়েছে, সব ক্লান্তি উবে গেছে। এক অপার্থিব রোমাঞ্চ ও অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে গেছে পুরোটা দেহ। প্রচুর রিকশা-সাইকেল-মানুষে আকীর্ণ পুরান ঢাকার মতো হিজিবিজি ছোট্ট একটি পাড়া এই দেওবন্দ। দেওবন্দের এই ভীড় যেনো এক স্বর্গীয় উল্লাস। আবার কখনো মনে হয়, কোথায় উল্লাস! এখানে তো চিরপ্রশান্তির মৌনতা বিরাজ করে আছে সদা।

মসজিদে রশিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আযানে ছেদ পড়লো ভাবনায়। এবং ঠিক একই মুহূর্তে আমায় ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেলো একঝাঁক সাদা পায়রা। আমি আবার দেওবন্দে এসেছি! এই আমি ফের লাল ইটের উঁচু প্রাচীরের পাশ ধরে হাঁটছি!! খুশিতে পুরো শরীরের পশমগুলো নেচে উঠলো। ঐ তো নেয়ামতুল্লাহ আযমী ঠকঠক করে হেঁটে যাচ্ছেন! আহা, আহা। এ-ই তো আমার ঘর! চোখ বুজে গেলো। তারপর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো... আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

দু'আ শেষে চোখ খুলতেই দেখি কিছু নারী পথ অতিক্রম করছে। প্রচুর ঢিলেঢালা বোরকা। নেকাবে চোখ বরাবর শুধু জালির মতো ফুটোফুটো। বোরকার উপর কোথাও দেহের ঢেউ আছড়ে নেই...।

লেখক : শিক্ষার্থী, দারুল ইফতা ২য় বর্ষ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

কিশোর প্রতিভা

গ্রামের পানে কয়েকদিন

বৈশাখ মাস। তখন আমি আম্মুর সাথে দাদুবাড়ি গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। রোদে রাঙা ঝলমলে ছিল সে দিনটি। আমরা নতুন ধান তুলতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব মজা করেই সে দিনটির বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হল। মাগরিবের পর কুরআন পড়তে বসলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। তখন সন্ধ্যা ৭টা কি ৮টা হবে। সাথে সাথেই বিদ্যুত চলে গেল। সারারাত আর এলো না।

আমাদের বাড়িটা গ্রামের বেশ ভেতরে। পরিবেশটা অনেক সুন্দর। বড় উঠোন ঘিরে চারিদিকে ঘর। একপাশে ভিতরে প্রবেশের বড় একটি গেইট। বাড়ি থেকে বের হলেই দক্ষিণ পাশে টলটলে পানির এক ছোট্ট পুকুর। দাদু একসময় এ পুকুরে মাছ ধরতেন। বড়শিতে কত্তো বড় মাছ দাদু ধরতেন! আমি পাশে বসে শুধু দেখতাম। তিনি আমাকে আদি যুগের রাজা-বাদশাহদের গল্প শুনাতেন। খুব মজা পেতাম। এমনিতেই গল্প আমি একটু বেশিই পছন্দ করি। তাতে যদি হয় আদি যুগের রাজাদের কাহিনী তাহলে তো খুশির কোন সীমাই থাকে না। এখন তিনি আর মাছ ধরতে পারেন না; কিন্তু রাজা-রানীর গল্প এখনো শুনান। পশ্চিম পাশে একটি বড় বাঁশঝাড়। মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে মূল সড়কে।

পরদিন সকাল। আম্মুর ডাকে ঘুম ভাঙল। আম্মু জোরে জোরে বলছেন, জলদি বাইরে এসে দেখ! আমি কিছুটা ভড়কে গেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলাম। বললাম, কী হয়েছে? আম্মু বললেন, আমাদের পাশের বাড়ির চাচীদের একটি বিশাল কড়ই গাছ ঝড়ে পড়ে গেছে। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম– এত্তো বড় গাছ পড়ে গেল! তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি সত্যিই একটা ইয়া বড় কড়ই গাছ পড়ে আছে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ে আছে। এক বেহাল অবস্থা; প্রচণ্ড ঝড়ে যেমনটি হয়। জানতে পারলাম পুরো গ্রামেই এই অবস্থা। বিদ্যুত আসবে না। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুত। তিনদিনেও এমুখো হয় কিনা সন্দেহ!

জীবনে প্রথম এত তীব্র ঝড় হতে দেখলাম। সেদিন প্রচণ্ড রোদ হল। খুশিও লাগছে, আবার কষ্ট হচ্ছে। উঠোনে ধান শুকিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। আর কষ্টটা হল, বিদ্যুত নেই। ঘরে গিয়েও শান্তি পাবো না। খাওয়ার পানি পর্যন্ত নেই। পাঁচ মিনিট হেঁটে গিয়ে দূরে এক আপুর বাড়ির চাপ কল থেকে পানি আনতে হয়। সে যে কী অবস্থা! আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাযত করুন।

তিন দিন বিদ্যুত ছিল না। চতুর্থ দিন বিদ্যুত অফিসের লোকজন এলো। তবে বিদ্যুত আসবে কিনা জানি না। আশায় থাকলাম আর কষ্টের প্রহর গুণতে থাকলাম।

আমিই বেশি পাগল ছিলাম বাড়িতে আসার প্রতি। এবার শিক্ষা হয়ে গেছে। মনে মনে বললাম, আর বাড়িতে আসার জন্য পাগলামী করব না। অবশেষে রাত দশটায় বিদ্যুত এলো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে অতল ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আমাতুর রব তাশফিয়া
স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বুযুর্গের সমাধি

রাহমানিয়ায় ভর্তি হওয়ার পর জানতে পারলাম, হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. হলেন হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা। ঢাকা থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরের মোমেনশাহী জেলার প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ ইসলামিয়া। এটি হযরতের হাতে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান। হযরতের ফয়েয দ্বারা প্রত্যহ মাদরাসাসহ পুরো শহরবাসী সিক্ত হচ্ছেন। মাদরাসার হিফয বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেষে হযরতের কবর। একদিকে তিলাওয়াতের শ্রুতিমধুর আওয়াজ, অন্যদিকে হাজারো উলামা-মাশাইখের বরকতময় আসা যাওয়া। সূর্যের আলো বিকশিত হওয়ার পরই হযরতের কবরে উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এটা নিত্য দিনের স্বাভাবিক দৃশ্য। সকলেই নীরবে তিলাওয়াত, তাসবীহ, দু'আ, দুরূদ পাঠে ব্যস্ত থেকে অশ্রু চোখে চলে যায়। সে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ। হযরতের সুযোগ্য সাহেবযাদা মাওলানা আনওয়ার শাহ সাহেবের নিকট শুনেছি, তিনি পিতার কবর যিয়ারত ব্যতিরেকে কখনোই মাদরাসায় প্রবেশ করেন না। সত্যিই যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র!

আমি তখন নাযিরা বিভাগে পড়ি। এতকিছু না বুঝলেও এতটুকু বুঝতে বাকি ছিল না যে, এখানে শায়িত ব্যক্তি নিশ্চয় বড় আলেম ছিলেন, বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের চিরস্থায়ী শয়নস্থলও এমন মুবারক সমাধীরূপে কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

আত্মসমালোচনা

সময় তার নিজ গতিতেই চলতে থাকে। কোন বাধা সে মানে না। আর এই সময়কে যারা কাজে লাগায় তারা বড় হয়। সময় মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে যুগে যুগে অনেক মনিষি তৈরি হয়েছে।

এক সময় আমরা ছোট ছিলাম। তারপর বয়স বাড়ল। না, বরং নির্ধারিত সময় থেকে কিছু কমল। আর আমরা হয়ে গেলাম বড়। এখন বুঝি; তখন বুঝতাম না। যা বোঝানো হতো তাই বুঝতাম। মান্য করে চলতাম; চলতে হত।

যাক মানুষতো বোঝে না; কোন কাজে তার ফায়দা। যদি বুঝতো তাহলে সে তার ঐ কাজটা নিয়ে পড়ে থাকত। অথচ যে কাজে ফায়দা নেই সেতো শুধু ঐ কাজ নিয়েই পড়ে থাকে। উপকারী কথা বললে তার শরীরে আগুন ধরে যায়; শুনতেই চায় না। কিইবা করবে! সেতো বড় অপারগ। আসলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে অনেক সুন্দর বিবেক দিয়েছেন। দিয়েছেন বিবেকের পরিচ্ছন্নতা। তাই পরিচ্ছন্ন বিবেকের পরিশুদ্ধতা খুবই প্রয়োজন।

মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন
আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, সদর যশোর

তার স্মৃতি আমাকে আজো কাঁদায়

সকাল থেকেই মনটা বিষণ্ন, খুবই বিষণ্ন। কোন কিছুই ভালো লাগছে না। বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু ব্যথিত মন কোন উত্তর দিচ্ছে না। প্রকৃতির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। সেও খুব বিষণ্ন। গোটা পৃথিবীটা স্তব্ধ ও নীরব। গাছপালা বেদনায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতাগুলো বেদনায় ঝরে পড়ছে। নেই কোন শব্দ, নেই কোন নড়াচড়া; আছে শুধু বেদনা আর বেদনা। আসমানটাও বেদনায় নীল হয়ে আছে। পশুপাখি কিচিরমিচির রবে শূন্যে ছুটোছুটি করছে। কাকগুলো কা-কা করে মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন? কী হল আসমানের? কী হল পশুপাখি ও গাছপালার? ধীরে ধীরে বিষণ্নতা বাড়তেই থাকলো।

এভাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এলো। জুমু'আর ক্ষাণিক আগে একটা এ'লান কানে ভেসে এলো। সাথে সাথেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, আমাদের আশরাফুল মাদারিস সতীঘাটা যশোর মাদরাসার বড় হুযূর মাওলানা নাসিরুল্লাহ দা.বা. এর ভাই মাওলানা মুফতী খবীরুল্লাহ সাহেব ইন্তিকাল করেছেন। বেদনাদায়ক এ সংবাদ শোনা মাত্রই যেন আসমান ভেঙে পড়ল। হৃদয়টা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল।

জুমু'আর পরপরই জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গিয়ে দেখি শেষ বিদায়ের লেবাস পরিহিত; শুয়ে আছেন তিনি। সেখানে শত শত উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলম উপস্থিত। দেখতে দেখতে আরো হাজার হাজার আলেম-উলামা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে এসেছেন। শুধু তাই নয়; তার জানাযার জন্য জনসাধারণেরও একটা বড় অংশ সমবেত হল। এক পর্যায়ে মাদরাসা ময়দান এতো লোকের স্থান সংকুলানে ব্যর্থ হল। দৃশ্যটি দেখে মনে হল, আজ যেমন তাকে বিদায় জানাতে হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের সমাগম হয়েছে তেমনি হয়তো হাজার হাজার ফেরেশতা তার ইসতিকবালের অপেক্ষায় আছে।

মাগরিব পড়ে জানাযার কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তখন সেখানে তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বড় ভাই বলেন, তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তার বংশে তিন শতাধিক আলেম রয়েছে। এর মধ্যে দেড়শ আলেমের ইলমের ধারক-বাহক ছিলেন তিনি। সেখানে যশোর দারুল আরকাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান দা.বা. বলেন, তিনি ছিলেন মুহাক্কিক আলেম। প্রতিটি বিষয় তাহকীক করাই ছিল তার স্বভাব। তার ইলমের গভীরতা দেখেই উলামায়ে কেরাম তাকে মাদরাসার প্রিন্সিপালের আসনে বসিয়েছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে মাদরাসাটি উন্নতির সিঁড়িতে পদার্পণ করছিল। সেখানে উপস্থিত শাইখুল হাদীস মাওলানা রূহুল আমীন সাহেব দা.বা. বলেন, তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি তাকওয়া-তাহারাতে পরিপূর্ণ এবং তাতে তার কোন কমতি ছিল না। তিনি এমন ভাগ্যবান ছিলেন যে, ছাত্র যামানায় স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আফসোস! এমন ভাগ্য আমাদের ক'জনের হয়! তিনি আরো বলেন, ছাত্র যামানায় তিনি আমার সাথে অন্য ছাত্র ভাইদের চেয়ে বেশি সম্পর্ক রাখতেন।

বাস্তবেই তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনায়, আখলাক-চরিত্রে, ইলম-আমলে অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ স্বল্প পরিসরে তার ইলম-আমলের কোন দিকটা তুলে ধরবো? তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী। রাত-দিন উম্মাহর কল্যাণের ফিকিরে মগ্ন থাকতেন। সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। তিনি মুসলমানদের এ দুর্দিনে জাতির অন্ধকার পথে তুলে ধরেছিলেন আলোর মশাল। তিনি সকলকে ভালোবাসতেন এবং সকলেই তাকে ভালোবাসতো।

আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি এমন এক ব্যক্তিত্বকে যার ছিল উম্মাহর প্রতি খুবই মহব্বত ও দয়া। উম্মাহর এ নাযুক মুহূর্তে জাতির প্রতি ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। তার চিন্তা-চেতনা ও মেহনত-মুজাহাদার ফল আজো মানুষ ভোগ করছে। এমন এক ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি যিনি ছিলেন উম্মাহর সুখে সুখী এবং উম্মাহর দুখে দুখী।

সত্যিই তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। তার স্মৃতি শুধু আমাকেই নয় তালেবানে ইলমের সবাইকে ইলম-আমলের যাত্রাপথে উৎসাহিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে। তার স্মৃতি আমাকে আজো কাঁদায়, আজীবন কাঁদাবে। তাইতো কবি বলেন,

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম
আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, সদর যশোর

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল

rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯

০১৯২৭৩২৪৬৪৭

০১৯১২০৭৪৪৯৫